দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ
মারে না, মার খায়,
লাথি খায় জোড়া পায়ের
— পৃঃ ৭

করোনা মহামারীর সময়েও
মোদী বিরোধীরা রাজনৈতিক
বাকবিতণ্ডায় ব্যস্ত
— পৃঃ ১৩

৭২ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ১১ মে, ২০২০।। ২৮ বৈশাখ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

শাসক দলের নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ উৎসাহ যোগাচ্ছে পুলিশ পেটাতে

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद हैं, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध हैं।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ২৮ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১১ মে - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৪

ভারতকে একই সঙ্গে করোনা, সন্ত্রাসবাদ, ভুয়ো খবর, বিকৃত ভিডিও নামক ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে
□ সাধন কুমার পাল □ ৫

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মারে না, মার খায়, লাথি খায় জোড়া পায়ের □ সুজিত রায় □ ৭

শাসক দলের নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ উৎসাহ যোগাচ্ছে পুলিশ পেটাতে □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ৯

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার প্রেক্ষাপটে
□ বিমল শংকর নন্দ □ ১১

করোনা মহামারীর সময়েও মোদী বিরোধীরা রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডায় ব্যস্ত □ নাতাশা রাঠোর □ ১৩

করোনার ভয়াবহ তাণ্ডবেও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা, জবরদখল চলছেই □ ১৭

ভগবান বুদ্ধের বাণী শান্তিকামী মানুষ আজও সমানভাবে স্মরণ করে □ ডা: প্রকাশ মল্লিক □ ২১

কালের পদধ্বনি শুনিতে কি পাও?
□ প্রবাল চক্রবর্তী □ ২২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২৩

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

করোনা যুদ্ধে নির্ভীক সৈনিক

সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দেশ রক্ষা করে সৈনিকরা, তেমনই এই করোনা যুদ্ধেও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ সর্বস্ব পণ করিয়া দেশের মানুষকে রক্ষা করিবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়ায়েছেন। ভারতে করোনা সংক্রমণের প্রথম দিন হইতে অদ্যাবধি এদেশের চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের অক্লান্ত সেবা সমগ্র দেশের মানুষের শ্রদ্ধা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে। চিকিৎসক , স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশের এই নিরলস সেবাকার্যকে স্বীকৃতি দিতে আকাশ হইতে হেলিকপ্টারে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছে বায়ুসেনা। তাহারও পূর্বে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই অক্লান্ত সেবাকার্যকে অভিনন্দন জানাইতে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাইয়াছিলেন শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টধ্বনি অথবা করতালির মাধ্যমে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাফাইকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে। দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীর সেই আবেদনে সাড়া দিয়া শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। অবশ্য শুধু ভারতে নহে, সমগ্র বিশ্বেই এই চৈনিক মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রথম সারিতে থাকিয়া লড়াই করিতেছেন। মনে হইতেছে, নূতন এই বিশ্বযুদ্ধে চিকিৎসক সমাজই যেন রণাঙ্গণে প্রকৃত বীর সৈনিকের ভূমিকা পালন করিতেছে। সংসার, আত্মীয়পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিয়া, মৃত্যুর সঙ্গে বাজি ধরিয়া এই যুদ্ধে সমগ্র মানব সমাজকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে চিকিৎসক সমাজ। একজন চিকিৎসকের জীবন যে আর্ত পীড়িতের সেবায় উৎসর্গীকৃত— তাহাই আবার নূতন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে চিকিৎসক সমাজ। করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে একদিন মানব সমাজ নিশ্চিত ভাবেই জয়ী হইবে। সেই বিজয়ের জয়পতাকায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে চিকিৎসক সমাজের এই অবদানের কথা।

অন্যান্য পেশার মানুষের তুলনায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পেশার সঙ্গে যাঁহারা যুক্ত —এই করোনা যুদ্ধে তাঁহারাই সর্বাধিক সংক্রমিত হইতেছেন। কারণ, এই পেশার সঙ্গে যাঁহারা যুক্ত তাঁহারা বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াও পশ্চাদপসরণ করেন নাই। বরং বিপদকে তুচ্ছ করিয়াই তাঁহারা অসুস্থ ও পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়েগ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বহু চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী করোনা আক্রান্ত রোগীর সেবা করিতে গিয়া সংক্রমিত হইয়াছেন। সংক্রমণের দরুন চিকিৎসককে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে — এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে। তবু এক মুহূর্তের তরেও চিকিৎসকরা তাঁহাদের সেবার ব্রত হইতে বিরত হন নাই। তবে, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যখন জীবন পণ করিয়া এই যুদ্ধে লড়াই করিতেছেন, ঠিক তখনই প্রকাশ্যে আসিয়াছে আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার দৈন্যদশা এবং করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার চিত্রখানি। এই রাজ্যে চিকিৎসকদের সুরক্ষার নূন্যতম ব্যবস্থাটুকুও রাজ্য সরকার করে নাই। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ পিপিই(প্রাইভেট প্রোটেকশান ইকুইপমেন্ট) সরবারাহ করা হয় নাই। কোথাও কোথাও চিকিৎসকদের পিপিই-র বদলে বর্ষাতি পরিধান করিয়া করোনা রোগীর চিকিৎসা করিতে হইয়াছে। বহু রাজ্যে যেমন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিবার হইতে দূরে নিরাপদে রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে এই রাজ্যে তাহা করা হয় নাই। ফলে, এই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বাধ্য হইয়া তাঁহাদের পরিবারের সঙ্গেই থাকিতে হইতেছে। এবং কোনো চিকিৎসক সংক্রমিত হইলে তাঁহার পরিবারেরও সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইতেছে। তদুপরি এই সংকটের সময় রাজ্যের সরকারি হাসপতালগুলির বেহাল অবস্থাও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। একটির পর একটি সরকারি হাসপাতাল সংক্রমণের কারণে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এতদিন সময় পাইয়াও রাজ্য সরকার আপৎকালীন ভিত্তিতে কোথাও কোনো অস্থায়ী হাসপাতাল গড়িয়া তোলে নাই। করোনা আক্রান্ত হইলে সাধারণ মানুষকে একবার এই হাসপাতাল, একবার ওই হাসপাতাল ঘুরিতে হইতেছে। ইহা ব্যতীত, ক্যানসার বা কিডনি সংক্রান্ত গুরুতর রোগে যাহারা অসুস্থ, তাহাদের চিকিৎসার সুযোগও এখন হাসপাতালগুলিতে মিলিতেছে না। সব মিলিয়া ইহা পরিষ্কার হইয়াছে যে, যতই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের গল্প শুনানো হউক না কেন— রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটে নাই।

ইহার পাশাপাশি, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের আচরণ অত্যন্ত অমানবিক এবং নিন্দাজনক। বহু এলাকায় চিকিৎসক, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এক শ্রেণীর মানুষের হেনস্থার শিকার হইতেছেন। অভিযোগ উঠিয়াছে, কিছু এলাকায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বাড়িতে হামলা হইতেছে। তাহাদের এলাকা ছাড়া করা হইতেছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষাণা করিয়াছে, কোথাও চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের উপর এই ধরনের হামলা হইলে হামলাকরীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে শুধু আইন প্রণয়ন করিলে হইবে না, সমাজের গরিষ্ঠাংশ মানুষকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, চিকিৎসক ও স্বাস্থকর্মীরা নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া আমাদের রক্ষা করিতেছেন। করোনা যুদ্ধে এই নির্ভীক সৈনিকদের পাশে আমরাও রহিয়াছি— এই বার্তা দেওয়া এখন অতীব জরুরি।

সুভাষিতম্

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।

বঞ্চানঞ্চাপমানশ্চ মতিমান্ন প্রকাশয়েৎ।।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহবিবাদ, বঞ্চনা এবং অপমানের কথা কখনোই প্রকাশ করেন না।

ভারতকে একই সঙ্গে করোনা, সন্ত্রাসবাদ, ভুয়ো খবর, বিকৃত ভিডিও নামক ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে

এই মহামারীর সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে মানবতার সেবায় কর্তব্যরত ডাক্তার, নার্স, পুলিশ কর্মীদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালাচ্ছে এক দল মানুষ। কাশ্মীরের পাথরবাজদের অনুকরণে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পাথর ছুঁড়ছে, করোনা সংক্রমিত করতে থুতু ছেঁটাচ্ছে, মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছে, পোশাক ছিঁড়ে দিচ্ছে। এসবই নাকি বিচ্ছিন্ন ঘটনা!

সাধন কুমার পাল

গত ৪ মে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া একটি বক্তব্য দিয়ে লেখাটি শুরু করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘‘গোটা বিশ্ব যেখানে করোনার (কোভিড-১৯) বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সেখানে কিছু মানুষ প্রাণঘাতী ভাইরাসের মতোই সন্ত্রাসবাদ, ভুয়ো খবর এবং বিকৃত ভিডিয়ো ছড়িয়ে সমাজ ও দেশে বিভাজন তৈরি করছে’’। অর্থাৎ ভারতকে যুগপৎ করোনার চেয়েও ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদ, ভুয়ো খবর, বিকৃত ভিডিয়ো নামক ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। দেশের ভেতরে আক্রান্ত হচ্ছেন ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করোনা যোদ্ধারা, সীমান্তে আক্রান্ত হচ্ছেন সীমান্তরক্ষীরা। দেশ জুড়ে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করার চেস্টা চলছে। দেশের ঐক্য, সম্প্রীতি, লড়াই করার দৃঢ় সংকল্প আক্রান্ত হচ্ছে ভুয়ো খবর, বিকৃত বিডিয়ো নামক ভাইরাস দ্বারা।

সমস্ত দেশ করোনা যোদ্ধাদের সম্মান জানাচ্ছে। হিন্দু সমাজ তো করোনা যোদ্ধাদের মধ্যে ঈশ্বরের রূপ দেখতে পাচ্ছে। অনেককে বলতে শোনা যাচ্ছে মন্দির বন্ধ তো কী হয়েছে ভগবান তো এখন সাদা পোশাক পরে হাসপাতালে ডিউটি করছেন। পাশাপাশি এর বিপরীতে দৃশ্যও দেখা যাচ্ছে দেশের সর্বত্রই।

গত ১ এপ্রিল বুধবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের একটি পাঁচ সদস্যের দল করোনা স্ক্রিনিংয়ে গেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। লাঠি, কাঁচের বোতল, পাথর নিয়ে হামলা চালানো হয়েছে তাঁদেরয় ওপর। বাদ যায়নি মহিলা চিকিৎসকরাও। বিশ, সম্প্রদায়ের দলবদ্ধ মানুষ ডাক্তারদের ইঁট, পাথর নিয়ে তেড়ে আসে। প্রাণ হাতে করে ডাক্তারা দৌড়াচ্ছেন, এই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে সমস্ত বিশ্ব দেখেছে।

২ এপ্রিল। দিল্লির নিজামুদ্দিন মরকজে যোগদানের পরে তবলিগি জামাতের কিছু মানুষ যারা কর্ণাটকে ফিরে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার জন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে আশা কর্মীরা একটি বিশেষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে ঘরে ঘরে জরিপ চালাচ্ছিলেন। কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বি শ্রীরামালু নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন। যাতে দেখা গেছে এই জরিপ দলের সদস্য দৃশ্যত বিচলিত আশাকর্মী কৃষ্ণাবেণী ভিডিয়ো বার্তায় অভিযোগ করেছেন যে, ‘তারা আমাদের ব্যাগ এবং মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়েছিল। তারা আমাদের একটি ফোন কলও করতে দেয়নি। আমি বিগত পাঁচ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু কখনও কখনও এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি।’ আরও অভিযোগ, সেদিন স্থানীয় মসজিদের মাইক থেকে থেকে ভিড় করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছিল।

> **এই কঠিন পরিস্থিতিতে ক্ষমতালোভী, তোষণকারী, স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কারবারিদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে সচেতন নাগরিক ও লড়াকু সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হবে।**

গত ১৫ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের মুসলমান অধ্যুষিত নবাবগঞ্জ এলাকায় করোনা সংক্রামিতদের খোঁজ করতে গেলে একদল উন্মত্ত জনতা কর্তব্যরত ডাক্তার, নার্স ও অ্যাম্বুলেন্সের ওপর পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। এই চিকিৎসক দলকে উদ্ধার করতে যাওয়া পুলিশ দলের ওপরও চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় একজন ডাক্তার ও ফার্মাসিস্ট-সহ তিন জন গুরুতর আহত হন।

গত ২১ এপ্রিল ইন্ডিয়া টিভির রিপোর্টার মণীশ প্রসাদ দিল্লির লোকনায়ক জয় প্রকাশ হাসপালের কাছে গেলে আশা নামে একজন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী এগিয়ে এসে তার ভয়ংকর

অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। আশা দেবীর বক্তব্য ছিল, নিজামুদ্দিন মরকজ থেকে আসা আইসোলেশনে থাকা তবলিগিদের খাবার দিতে গেলে ওরা তাকে ঘাড়ে ধরে ওই খাবার টেস্ট করাতে বাধ্য করে, ওর পরনে থাকা পিপিই কিট টেনে ছিঁড়ে দেয় এবং হুমকি দেয়। তিনি কোনো রকমে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে আসেন। তিনি আরও বলেন, এতদিন টিভিতে তবলিগিদের তাণ্ডবের কথা শুনে বিশ্বাস হতো না। কিন্তু তার নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর সেই ভাবনা পালটে গেছে। আবার ২৩ এপ্রিল ২০২০ দিল্লির ওই লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতালের চিকিৎসকরাও অভিযোগ করেন আইসোলেশনে থাকা করোনা আক্রান্ত তবলিগিরা তাদের মাস্ক খুলে নিচ্ছে, ভাইরাস সংক্রামিত করার হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে ডাক্তারবাবুরা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কাছে অভিযোগও করেন।

দিল্লির দ্বারকা এলাকায় কোয়ারেন্টাইনে থাকা তবলিগিদের বিরুদ্ধে বোতলে করে প্রস্রাব ছুড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে। ঘটনাটি ৮ এপ্রিলের। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দৌলতে সবাই ঘটনাটি দেখেছে।

১৪ এপ্রিল হায়দরাবাদের ওসমানিয়া জেনারেল হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে সন্দেহভাজন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর ছেলের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। হায়দরাবাদের গান্ধী হাসপাতালে একজনের করোনা ধরা পড়ায় আক্রান্ত হন চিকিৎসকরা। গুজরাটের সুরাট থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর হামলার খবর আসে। বিহারের মুঙ্গের শহরে করোনা সংক্রমিতদের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে গেলে পুলিশ, ডাক্তার-সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি দলকে স্থানীয়দের হাতে আক্রান্ত হতে হয়।

গত ২৮ এপ্রিল বিকেলে কনটেনমেন্ট এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় বেলিলিয়াস রোডে টহল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। পিছু ধাওয়া করে পুলিশকে মারধর করা হয়।পুলিশের দিকে ধেয়ে আসে এলোপাথাড়ি ইট, পাথর। পুলিশের দুটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োর জেরে এই ঘটনার সাক্ষী সাধারণ মানুষ। দেশের বিভিন্ন জায়গাতেই নিরন্তর ঘটে যাচ্ছে এরকম আক্রমণের ঘটনা।

এ কাজ যারা করছে তাদের সন্ত্রাসবাদী বলা হবে কিনা তা অবশ্যই আলোচ্য বিষয় হতে পারে। কারণ ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এখন পুরো ভারত ভগবানের চোখে দেখছে। অন্যদিকে এই উন্মাদীরা নার্স ও ডাক্তারদের ওপর থুতু নিক্ষেপ করছে, আক্রমণ করছে। শুধু এই নয়, যে ডাক্তারদের টিম তবলিগি জামাতের এলাকায় যাচ্ছে সেখানে চিকিৎসক, পুলিশ সকলকেই আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে। জামাতিদের বিরুদ্ধে বলার জন্য নিউজ পোর্টাল-সহ বাকি সংবাদমাধ্যমগুলিকেও হুমকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যার জন্য অনেক সংবাদমাধ্যম জামাতিদের উপদ্রব সম্প্রচার করা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে সত্য এই যে, এখনও অবধি উন্মাদী জামাতিরা তাদের উপদ্রব বজায় রেখেছে। এক হাসপাতালে জামাতিরা নগ্ন হয়ে নার্সদের সামনে নাচানাচি করেছে, অশ্লীল ইঙ্গিত করছে।

ভারতে করোনা ভাইরাস নিয়ে একাধিক ভুয়ো তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে। আর তার জেরে হোয়াটসঅ্যাপ একসঙ্গে একের অধিক ব্যক্তিকে কোনো ম্যাসেজ ফরোয়ার্ড না করার মতো বড়োসড়ো পদক্ষেপ নিয়েছে। করোনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভ্রান্তিকর পোস্ট ছড়ালে শাস্তি, হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি জানান করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই কঠিন সময়ে ফেসবুক, টুইটার বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়া ভুল পোস্ট মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ও করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকে দুর্বল করছে। তাই এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের।

গত এক মাসে জম্মু ও কাশ্মীরে ১২টিরও বেশি গুলির লড়াই হয়েছে, যেখানে ২৭ জন নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ৩ মে , জম্মু ও কাশ্মীরের হান্দোয়ারায় সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে ২ লস্কর কম্যান্ডার-সহ ৫ জন নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুজন পদস্থ আধিকারিক, একজন কর্নেল, একজন মেজর। ৪ মে, একই জায়গায় গুলির লড়াই হয়, সেখানে অন্তত ৩ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয় এবং ৭ জন আহত হন। সিআরপি এফের টহল দেওয়ার সময় হামলা চালায় জঙ্গিরা।

এই মহামারীর সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে মানবতার সেবায় কর্তব্যরত ডাক্তার, নার্স, পুলিশ কর্মীদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালাচ্ছে এক দল মানুষ। কাশ্মীরের পাথরবাজদের অনুকরণে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পাথর ছুঁড়ছে, করোনা সংক্রমিত করতে থুতু ছেঁটাচ্ছে, মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছে, পোশাক ছিঁড়ে দিচ্ছে। জামাতের 'ধর্মনিরপেক্ষ' মুখগুলি মিডিয়ায় বসে নিরন্তর বলে যাচ্ছে এগুলি সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সে সমস্ত মিডিয়া এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে সরব হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও মুসলমান বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হলেই সেকুলার ব্রিগেড মাঠে নেমে ভিক্টিম কার্ড খেলছে। বলা হচ্ছে ভারতে মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে। করোনা মোকাবিলার নামে শুধু বেছে বেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর মিডিয়া প্যানেল ডিকাসশনের আয়োজন করছে, কলাম লেখা হচ্ছে, ব্লগ লেখা হচ্ছে, একই সঙ্গে বিদেশি মিডিয়া সরব হচ্ছে ভারতে মুসলমান বিদ্বেষের অভিযোগ নিয়ে। পালঘরের নির্মম সন্ন্যাসী হত্যার ঘটনা নিয়ে কিংবা করোনা যোদ্ধাদের ওপর বর্বর আক্রমণ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষ তকমাধারী একদল প্রাক্তন হয়ে যাওয়া আমলা মুসলমান বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে চিঠি দিচ্ছেন দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের। 'জামাতিরা হিরো' হ্যাস ট্যাগ টুইটারে ট্রেন্ড করছে। ইয়াকুব মেননের ফাঁসি রদ করানোর জন্য রাত তিনটের সময় যে আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্ট খুলিয়ে ছিলেন সেই সমস্ত জাদরেলরাও জামাতিদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ছেন। খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দেশের ভিতরে-বাইরে এক বিরাট ভারত-বিরোধী ইকোসিস্টেম কাজ করছে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে হারিয়ে দিয়ে এই দেশকে ইউরোপ আমেরিকার মতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত করতে।

সামনে কঠিন লড়াই। এই মহামারীর জন্য প্রচুর মানুষ কর্মচ্যুত হবে, অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হবে। এই সংকটের সময় মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ভড়কে দেওয়া, সরকার বিরোধী করে তোলা, বিশৃঙ্খলা তৈরি করা খুবই সহজ। বিগত সত্তর বছর ধরে এই 'সংকট কেন্দ্রিক' নেতিবাচক রাজনীতির ফলে সম্পদে পূর্ণ ভারত এখনো দরিদ্র দেশের তকমা বহন করে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে একটি সাকারাত্মক রাজনীতির বাতাবরণ তৈরি হলেও এই মহামারীর জেরে দেশজুড়ে আবার একবার সেই নেতিবাচক রাজনীতির উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে ক্ষমতালোভী, তোষণকারী, স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কারবারিদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে সচেতন নাগরিক ও লড়াকু সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ মারে না, মার খায়, লাথি খায় জোড়া পায়ের

সুজিত রায়

কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। না, এ প্রবাদ আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো নয়। গত ৫/৬ বছর আগেও প্রবাদটাকে মানুষ বিশ্বাস করত।

কিন্তু ইদানীং বিশেষ করে গত ২/৩ বছরে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন এতটাই রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে যে পুলিশকে ভয় পাওয়াটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর গল্পকথা। কারণ এখন পুলিশই ভয় পায় মানুষকে। তাই সে কখনও লুকোয় টেবিলের তলায়, কখনও আলমারির পেছনে, কখনও মানুষের তাড়ায় ম্যারাথন দৌড় লাগায়। কখনও-বা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই এমন একটা মুখভঙ্গি করে সব দেখেও কিছুই দেখে না। কখনও-বা পাড়ার 'দাদা'দের 'স্যার.... স্যার' বলে হাত কচলায়। 'একটু দেখবেন স্যার' বলে শাসকদলের আমচা-চামচাদের বাড়িতে কলাটা-মুলোটা পৌঁছে দেয়। আর তা না হলে কখনও লাঠির ঘা, কখনও পাথরের ঘা খেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় গিয়ে শুয়ে পড়ে হাসপাতালের শয্যায়। আমরা বড় বড় চোখে দেখি। 'আহা.. বেচারা.. পুলিশ বলে কী আর মানুষ নয়' বলে আপ্তবাক্যে নিজেদের সান্ত্বনা দিই। দিদির ভাইদের নৃত্যনাট্য দেখি।

২০১৮-য় পশ্চিমবঙ্গে দিদির ভোটব্যাঙ্কে বিজেপি-র হাত পড়ে যাওয়ার পর পুলিশের সেই রাগী প্রশাসকের ভূমিকাটা একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। পুলিশ হয় দিদির আঁচল ধরে ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে নবান্ন থেকে নিউ টাউন। আর সপাটে জোড়া পায়ের লাথি খাচ্ছে হাওড়ায় বেলিলিয়াস রোডে, বেলগাছিয়ায়, রাজাবাজারে, তপসিয়ায়, ট্যাংরায়, পার্ক সার্কাসে, খিদিরপুরে, মেটিয়াবুরুজে।

আমরা যারা এতদিন বলতাম—আহা! পুলিশ বলে কী আর মানুষ নয়? তারাও ধরে নিয়েছে দিদির প্রশাসনে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ হয়েছে ফুলিশ। আর দিদির প্রশ্রয়ে ভাই-বোনেরা পরিণত হয়েছে বাঘে। ওরাই এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বিশেষ করে খালপাড়ের বস্তি এলাকায় আর মুসলমান মহল্লায়। এসব জায়গায় 'তিনোমুল' ভাই বোনেরাই—রাম কিংবা রহিম ছোট ছোট এলাকার 'মুখ্যোমন্ত্রী'। এতদিন অনুশাসন বজায় রাখতে পুলিশ পিটিয়েছে। এখন পালটা পিটুনি খাচ্ছে পুলিশ, এমনকী এই লকডাউনের বাজারেও।

পুলিশ নিরুপায়। কারণ এরাজ্যের অষ্টম মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর

পুলিশ উর্দিটা পরে থাকে মর্যাদা দিতে নয়, নিতেও নয়। চাকরি রাখতে পরতে হয় তাই। ওই স্কুলের লাস্ট বেঞ্চের ছাত্রদের মতো। পাশ করুক বা না করুক। ইউনিফর্মটা পরতেই হবে। পুলিশও পরে। সেই ইউনিফর্মেই জোড়া পায়ের ছাপ পড়ে। রক্তের দাগও জমাট বাঁধে। লকডাউন হয়েই থাকে পুলিশের মুখ। রাজ্যটা তো দিদির।

আমলে পুলিশের অবস্থা হলো সেই 'আসতে কাটে, যেতে কাটে'-র মতো। জলে বাঘ, ডাঙায় কুমির। অনুশাসন বজায় রাখতে পুলিশ গুলি চালালে, লাঠি চালালে পুরস্কার জোটে হয় সাসপেন্ড অথবা ট্রান্সফার। আর না চালালেও জোটে পুরস্কার নয় তিরস্কার। তাই বেলিলিয়াস রোডে করোনার সংক্রমণ রুখতে ফেজ আর লুঙ্গি পরিহিত জনগণকে 'রমজান পালনের চেয়ে লকডাউন পালন করা বেশি জরুরি' বোঝাতে গিয়ে জোড়া পায়ের লাথি খেতে হয়েছে। র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের নিয়মিত জিম করা ৩২ প্যাকের আঁটোসাঁটো যুব-পুলিশ বাহিনীও লেজ খাড়া করে দৌড় দেয় উলটো পথে। আর নবান্নে বসে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়—'একটা ঘটনা ঘটেছে। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে নাকি?' সত্যিই তো! এমন 'ছোট ঘটনা' তো ঘটেই, ঘটেছেও। পার্কস্ট্রিটে ধর্ষণ হয়েছে মধ্যরাতে ৩/৪ জন মুসলমান যুবকের কামার্ত পিপাসায়। কামদুনিতে দিল্লির মতোই এক নির্ভয়াকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ছিবড়েটা ছুঁড়ে ফেলেছে স্থানীয় মুখ্যোমন্ত্রীরা। আর আমরা শুনেছি সেই অমোঘ বাণী, 'ছোট ঘটনা'। প্রতিবাদীদের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে 'মাওবাদী' পোস্টার। মনে পড়ে, বানতলায় তিন মহিলা সরকারি কর্মচারীকে গাড়িসহ পুড়িয়ে মারার ঘটনায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও বলেছিলেন—'এসব তো কতই ঘটে'। তবু পুলিশি অ্যাকশনটা হতো। আঠারো ঘা না হোক ন' ঘা তো পড়তই। এখন উলটে পুলিশের পা ভাঙছে। মাথা ফাটছে। প্রতিবাদ করা যাচ্ছে না। করলেই চাকরি যাবে। এই পট পরিবর্তন কেন?

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, এর পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ। প্রথম কারণ, রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনেও পালাবদল ঘটেছে। পুলিশের যেসব কর্তাব্যক্তি দিদির আঁচল ধরে দায়িত্ব পালন করতে চাননি, তাঁরা বেশিরভাগই পাড়া বদলেছেন। অর্থাৎ সেই সব আইপিএস অফিসাররা কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছেন দিল্লির আশ্রয়ে। শুধু আইপিএস নয়, বহু আইএএস অফিসারও বদলির সুযোগটা কাজে লাগিয়েছেন, কারণ তাঁরা পদমর্যাদার ঐতিহ্যটাকে আদিগঙ্গার পচা পাঁকে বিসর্জন দিতে চাননি। যাঁরা রয়ে গেছেন তাঁরা ধরে নিয়েছেন, মাথা গুঁজে এরাজ্যে পড়ে থাকলে মানসম্মান ভোগে যাবে ঠিকই কিন্তু ক্ষমতার বাতায়নে বসে পার্থিব আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যটা উপভোগ করা যাবে সহর্ষে।

দ্বিতীয়ত, দিদি কংগ্রেসি ঘরানার হলেও, সাজতে চান কমিউনিস্ট। তাই মানুষের গায়ে লাঠির ঘা দিদির না-পসন্দ। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর মৌখিক কিংবা বাস্তবিক লাঠৌষধির ওপর দিদির নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে ২৪ ঘণ্টা। পুলিশ করবেটা কী? করোনা ছড়ালে ছড়াবে। প্রশাসন নিজেই তো 'ছড়াচ্ছে'। পুলিশের দোষ দিয়ে লাভ কী?

এও বাহ্য! মাননীয়া নিজ মুখেই 'সততার প্রতীক' হয়ে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন—যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি তো খেতেই হবে। বড়ো সত্যি কথা। ওনার এখন ভরসা ওইসব দুধেল গাই। বাকি ভোট ধরে রাখার ওষধি স্বয়ং প্রশান্ত কিশোরেরও নেই। তার ওপর আবার ভয়ংকর চাপ চাপিয়েছে মিম বা মজলিস-ই-মুসলিমিন-এর ভয়ংকর আগ্রাসী নেতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ঘোষণা করে দিয়েছেন, ২০২১-এ রাজ্যের ১৮০ বিধানসভা কেন্দ্রে মিম প্রার্থী দেবে। এই ঘোষণাই তো রাজ্যের মুসলমানরা কেন্দ্রীয় নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে তছনছ করল গোটা রাজ্যে। দিনের পর দিন কড়কড়ে নগদ ৫০০/১০০০/১৫০০ টাকার নজরানা পেয়ে মুসলমান মা-বোনেরা দিনরাত ধরনা দিয়ে পড়ে রইল পার্কসার্কাস ময়দানে। সঙ্গে বাড়তি গরমাগরম বিরিয়ানির প্যাকেট। বোঝাই যাচ্ছে কোটি কোটি বিদেশি মুদ্রার খেলা চলছে এরাজ্যে মিমের নেতৃত্বে। পাল্লা দেবার ক্ষমতা 'তৃণমূল'-এর নেই। অগত্যা রসুল-রহিমদের খুশি রাখতে হলে কোনোভাবেই ওদের লকডাউন করা যাবে না। লাকআপ তো নয়ই। তার জন্য করোনা ছড়ালে ছড়াক। পুলিশের মাথা ফাটুক। ঠ্যাং ভাঙুক। একশো লোক লাথি মারলে এলাকায় একশো পুলিশের গাড়ির সাইরেন বাজিয়ে লোক দেখানো ৮/১০টা লুঙ্গিধারীকে গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দাও। গাছেরও খাওয়া হলো, তলারও কুড়োনো হলো। ভোট বড়ো বালাই। দিদির কী দোষ। জীবনভর ওটাই তো শিখেছেন, শিখিয়েছেন প্রশাসন মানে এটাই। পশ্চিমবঙ্গের মহল্লায় মহল্লায় আজ ছড়িয়ে আছে জ্যোতিপ্রিয়, অনুব্রত, ববিরা। নির্দেশ আছে—জেলায় জেলায় এরাই শেষ কথা। লকডাউন করতে গেলে এরাই করবেন। লক আপের চাবি থাকবে এদের হাতেই। কেন্দ্রের পাঠানো রেশনের চালের বস্তায় 'বাংলার গর্ব মমতা' ছাপা ফ্লেক্স এরাই সাঁটবে এফ সিআই ছাপের ওপর। আর তার বেশিটা অনুব্রতরা পাঠাবেন ক্যাডারদের ঘরে ঘরে। বাকিটা পার্টির ত্রাণ সেবায়। পুলিশ তুমি কিছু দেখবে না। আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলবে তুমি কিছু দেখনি।

পুলিশ তাই কিছু দেখছে না। দেখবেও না। এরাজ্যে সেই তিন বাঁদরশিশুর মতো 'দেখব না, শুনব না, বলব না'-র প্রতীক হয়ে চুপচাপ বসে থাকাই ভালো। কী দরকার? এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে মাস গেলে মাইনেটা তো মিলছে। ডিএ না মিলুক। উপরিটা তো হাত পাতলেই কেল্লা ফতে। অতএব মাভৈঃ। অনুব্রতর মাথায় অক্সিজেন কম যায় কী বেশি যায় ভেবে আমি কী করব। ওর ক্ষমতা বাড়ুক। জ্যোতিপ্রিয় রেশনের চালের হিসেব গুলিয়ে দিক। ববি ঠাণ্ডা মাথায়, মাথায় তুলুক সংখ্যালঘুদের। দিদির ভোট বাক্স ফুলে ফেঁপে ঢোল হোক, আমি পুলিশ কানাকড়ির মালিক। সেই তো লোকে বলবেই—'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো'।

অগত্যা পুলিশ উর্দিটা পরে থাকে মর্যাদা দিতে নয়, নিতেও নয়। চাকরি রাখতে পরতে হয় তাই। ওই স্কুলের লাস্ট বেঞ্চের ছাত্রদের মতো। পাশ করুক বা না করুক। ইউনিফর্মটা পরতেই হবে।

পুলিশও পরে। সেই ইউনিফর্মেই জোড়া পায়ের ছাপ পড়ে। রক্তের দাগও জমাট বাঁধে। লকডাউন হয়ে থাকেই পুলিশের মুখ। রাজ্যটা তো দিদির। ■

শাসক দলের নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ উৎসাহ জোগাচ্ছে পুলিশ পেটাতে

বিশ্বপ্রিয় দাস

> পশ্চিমবঙ্গে কেন এমন সংখ্যালঘুদের আইন না মানার প্রবণতা? কেনই বা আইনকে তোয়াক্কা না করার মানসিকতা এদের মজ্জায় মজ্জায় বসে গেছে? কেনই-বা অপরাধের পিছনে এদের নাম উঠে আসছে? কি বলবেন মুখ্যমন্ত্রী?

সারা দেশ এখন করোনা জ্বরে কাবু। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে বা বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যু ছিনিয়ে নিচ্ছে একের পর এক প্রাণ। দিশেহারা মানুষ পথ খুঁজছে বাঁচার। একদল সৈনিক এই মারণ মহামারীর সঙ্গে দিনরাত লড়াই করে চলেছে। দেশের সরকার আমাদের সামাজিক দিক থেকে সাহায্য চেয়ে লকডাউন ঘোষণা করেছে। কারণ একটাই, যাতে এই মারণ ভাইরাস গোষ্ঠী সংক্রমণ না ঘটাতে পারে। পরোক্ষে উদ্দেশ্য, এই ভাইরাসের সংক্রমণ শৃঙ্খলটাকে ভেঙে দেওয়া। প্রথমে সবার কাছে আকুতি করে সচেতন হতে বলেছেন করোনার বিরুদ্ধে লড়তে থাকা সৈনিকরা। এরপর যখন দেখা গেল এই কথা একটি শ্রেণী শুনলেও একটি বিশেষ শ্রেণীর কানেও ঢুকল না সে কথা। তারা তাদের মতো করে চলতে শুরু করে দিল। মনে জেদ, মানব না। আবারো তাদেরকে আবেদন করে সচেতন হতে বলল পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু তাদের বেপরোয়া মনোভাব সেই কথায় কান দিল না। যেসব সৈনিক এই করোনা যুদ্ধে লড়াই করছেন আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তাদের ওপর চড়াও হয়ে মারধোর শুরু করেছে তারা। কয়েকদিন আগে হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। সরাসরি যাদের দিকে চিরকাল আঙুল উঠে এসেছে, সেই মুসলমান সম্প্রদায় যে এর পিছনে, তা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু পুলিশকে মারা নয়, স্বাস্থ্য কর্মীদের হেনস্থা হতে হচ্ছে সংখ্যালঘু এলাকায় গেলে। একটু ফিরে গেলে, সেই ১৯৮৪ সালে গার্ডেনরিচে, ডিসি(পোর্ট) বিনোদ মেহতা ও তাঁর দেহরক্ষীর হত্যার প্রসঙ্গ মনে আসে। পশ্চিমবঙ্গে কেন এমন সংখ্যালঘুদের আইন না মানার প্রবণতা? কেনই বা আইনকে তোয়াক্কা না করার মানসিকতা এদের মজ্জায় মজ্জায় বসে গেছে? কেনই-বা অপরাধের পিছনে এদের নাম উঠে আসছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে গেলে একটাই উত্তর আসবে, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। আর এই রাজনীতি করতে গিয়ে মুসলমান তোষণের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত ছাড় দিয়ে দিয়েছে স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কারবারিরা।

কেন এই ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে মুসলমান তোষণ। একটু প্রকৃত ছবিটা দেখার চেস্টা করা যাক। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৯ শতাংশের মতো মুসলমান, আর এই কারণেই রাজ্যের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে এদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েই গেছে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই মুসলমান সম্প্রদায়কে নিয়ে টানাটানিও অব্যাহত। ভোটের রাজনীতির সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে মুসলমানদের সমর্থন পেলে পশ্চিমবঙ্গের ভোটযুদ্ধে জেতাটা মসৃণ হয়ে যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বামফ্রন্টের আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের একটা বড়ো অংশের সমর্থন বামেদের পক্ষে ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী সময় থেকে মুসলমানরা বামফ্রন্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে।

তাদের সমর্থন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়ে, এর ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের ভোটব্যাঙ্ক বাড়তে শুরু করে। আর তোষণের মাত্রাটাও লাগামছাড়া আকার নেয়। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়, মুসলমান সমাজ কখনই একভাবে কোনো নির্দিষ্ট দিকে ভোট দেয়নি। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রাজত্বকালে দক্ষিণবঙ্গে মুসলমানরা বেশি সংখ্যায় বামপন্থীদের ভোট দিলেও মুর্শিদাবাদ ও উত্তরবঙ্গের দুই মুসলমানপ্রধান জেলা মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেসের পাশে থেকেছে। এমনকী তণমূল কংগ্রেসের আমলে দক্ষিণবঙ্গে মুসলমানরা বামপন্থীদের কাছ থেকে সরে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে সমর্থন করলেও ওই তিন জেলায় কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য থেকে সরে আসেনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আরও বলেছেন, উর্দুভাষী মুসলমান ও বাংলাভাষী মুসলমানদের বেশ ভাগ আছে। এরা দুটি পৃথক সমাজ। লক্ষ্য করে দেখা গেছে বাংলাভাষী মুসলমানদের সিংহভাগই গ্রামবাসী, কৃষিজীবী বা নির্মাণশিল্পের শ্রমিক। অবাঙ্গালি মুসলমানদের অধিকাংশই শহরবাসী, শিল্পাঞ্চলে কাজ করে। এই দুই সমাজের মানুষেরা ভোটও দেয় নিজের মতো করে। ফলে এদের মন জেতার চেষ্টা করার জন্য নানা পথ নিতেই হবে। সেভাবেই বর্তমান রাজ্যের শাসকদল এগিয়েছে।

মুসলমান তোষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উদাহরণ, ইমামদের ভাতা দেওয়া। ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভাতা দিলেই গোটা মুসলমান সমাজের ভোট এসে যাবে, এই ছকের রাজনীতি এসে যায়। মমতা ব্যানার্জির মুসলমান ঘনিষ্ঠতা আজ সবাই জানে। তিনি ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি বা কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতির মতো কিছু ধর্মগুরুর সঙ্গে সঙ্গে এক মঞ্চ ব্যবহার করা বা ইদের আগে তিনি নিজেও রোজা রাখার কথা বলা, ইফতার পার্টিতে গেলে কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা, এর পিছনেও সেই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয়দের সঙ্গে হৃদ্যতা বাড়ানোর জন্য যা করতে হয় সব করছেন। এসব কারণে যখন সংখ্যালঘুরা দেখছে যে হাজার অপরাধ করলেও, তাদের গায়ে হাত তোলার সাহস রাজ্য সরকারের নেই। তাই বেপরোয়া হয়ে তারা পুলিশ পেটাতেও ছাড়ছে না। আর রাজ্যের সংখ্যালঘু অঞ্চলগুলি রাজ্যের তথাকথিত আইনের বাইরে। এই প্রসঙ্গে কথা বলেছিলাম বেশ কিছু পুলিশ কর্মীর সঙ্গে। তারাও মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না এই হেনস্থা। তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তারাও বেশ বীতশ্রদ্ধ তাদেরই সমাজের মানুষদের এই রকম আচরণে। ফলে তাদের মধ্যে একটা অসন্তোষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু করেছে। যেটা রাজ্যের প্রশাসনের কাছে ভবিষ্যতে খুব একটা সুখের হবে না। এমনটাই বলছে, রাজনৈতিক মহলের একাংশ। একদিকে করোনার বিরুদ্ধে লড়তে থাকা চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা, যারা হাসপাতালে জীবনপণ করে আমাদের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনছেন, আর একদল চেষ্টা করে চলেছেন আমাদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে, যাতে মারণ ভাইরাস আমাদের ছুঁতে না পারে। এইসব জীবনপণ করা করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকা সৈনিকদের যদি এভাবে মার খেতে হয়, হেনস্থা হতে হয়, তাহলে এই ত্যাগের মূল্যটা তারা কি পেলেন? কোথায় তাঁরা কুর্নিশ পাবেন, তা নয় একটি শ্রেণীর হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এটা কোনো ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

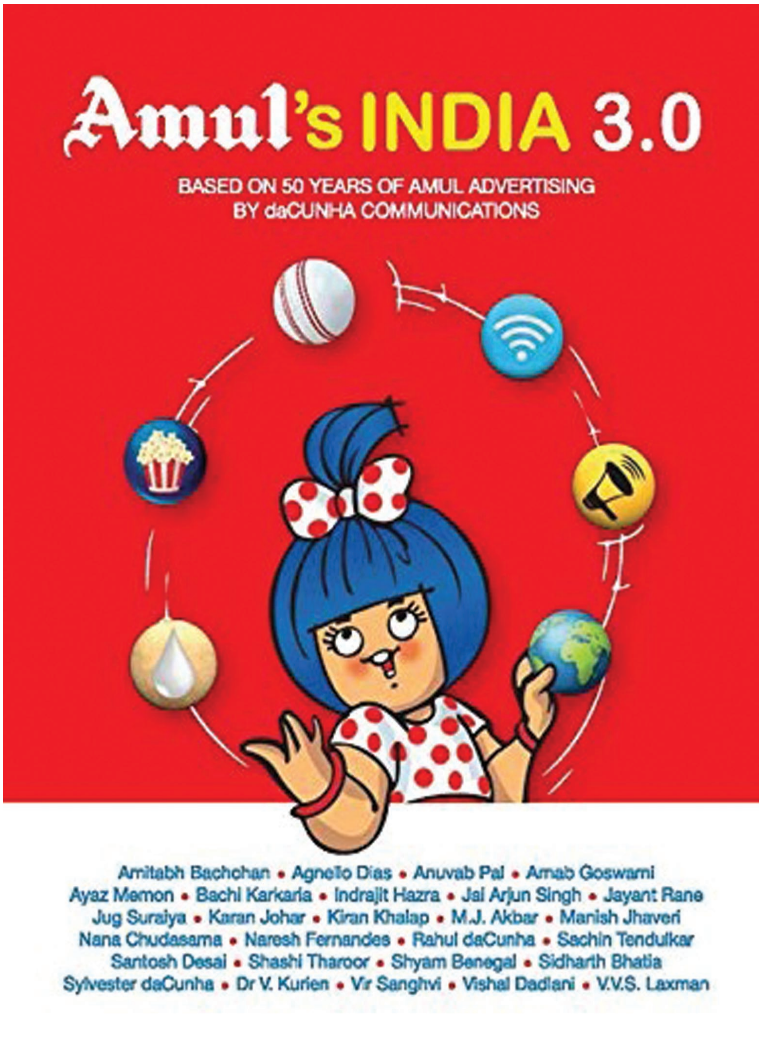

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার প্রেক্ষাপটে

বিমল শংকর নন্দ

৫০ ও ৬০-এর দশকে বিশেষত ৬০-এর দশকে এ রাজ্যের বামপন্থীরা একটি স্লোগানকে প্রায় 'মিথ'-এ পরিণত করেছিল। স্লোগানটা ছিল :

পুলিশ তুমি যতই মারো
মাইনে তোমার একশো বারো।

এই স্লোগান শোনা যেত লাল ঝান্ডাধারীদের মিছিলে। লেখা হতো কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে। ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ মালিকানাধীন কলকাতা ট্রাম কোম্পানি ট্রামভাড়া ১ পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে গোটা কলকাতা জুড়ে ট্রামের বহ্নুৎসব ও প্রতিরোধ আন্দোলনের নামে কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে হিংসাত্মক আন্দোলনের সূচনা ঘটে তার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৫৮-৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে যার রেশ চলেছিল ৬০-এর দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত। তৎকালীন শাসকদল কংগ্রেস এই আন্দোলন দমনে কঠোর পুলিশি ব্যবস্থা নিয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই স্লোগান। লাল ঝান্ডাধারীদের চোখে 'আধাসামন্ততান্ত্রিক' 'আধা-বুর্জোয়া' রাষ্ট্রের অঙ্গ এই পুলিশও 'খেটে খাওয়া মানুষের শত্রু—শ্রেণীশত্রু'। সুতরাং তাদের নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করে দেওয়া ছিল বামপন্থীদের এক সুচতুর রাজনৈতিক কৌশল। কারণ স্বাধীনতা এবং দেশভাগ পরবর্তী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে সরকারকে ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হচ্ছিল পুলিশবাহিনীর উপর। ফলে সেই পুলিশের মনোবল ভেঙে দিতে পারলে রাষ্ট্রকাঠামোটিকে অতি সহজে দুর্বল করে দেওয়া সম্ভব। আবার এই ধরনের স্লোগান আজ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে পুলিবাহিনীর মনোবলের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসাবে দেখা যেতে পারে। তথাকথিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর পুলিশও ভালো নেই এই ভাবনাটিকে পুলিশবাহিনীর মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা ছিল এই ধরনের স্লোগানে। ৬০-এর দশকের শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা ডিএ বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হয়তো এখানে বলার চেষ্টা হয়েছিল

শুধু পুলিশ প্রশাসন নয়, সাধারণ প্রশাসনের সমস্ত অঙ্গগুলিকেই তৈরি করা প্রয়োজন তাদের সামাজিক ভূমিকার কথা মাথায় রেখে। বহুদিন এদিকে নজর দেওয়া হয়নি। আগামী দিনে এই বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতির স্বার্থে।

সে পুলিশ সরকারের হয়ে কাজ করছে বটে, তবে আসলে সে সরকারের হাতের যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রী হওয়ার কোনো ক্ষমতা কিংবা সম্ভাবনা তার নেই। কার্ল মার্কসের 'বিচ্ছিন্নতা' তত্ত্বকে বাঙ্গলার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করার এ এক অক্ষম প্রচেষ্টা। তবে ইতিহাস তো এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া। ইতিহাসের গতিতে এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে মনে হয় গল্প উপন্যাসও যেন হার মেনে গেল। ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন কলকাতা ট্রাম কোম্পানি এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিলে সে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন বামপন্থীরা। ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে যে Tram and Bus Fare Enhancement Risistance Committee তৈরি করা হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন ফরেয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত কুমার বসু। এই কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এস.ইউ.সি. নেতা সুবোধ ব্যানার্জি, প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা সুরেশ ব্যানার্জি, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি এবং সিপিআই নেতা জ্যোতি বসু (তখন কমিউনিস্ট পার্টি একটাই ছিল)। ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন দমনে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এঁদের সমবেত কণ্ঠ এ রাজ্যের আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল। তাদের ভাষায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতা কোনো সভ্য সমাজে দেখা যায়নি। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সংবাদপত্র তাঁদের সুরে সুর মিলিয়েছিল। এর ৩৭ বছর পরে ১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট কলকাতার এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত এসইউসি দলের কর্মীদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে মাধাই হালদার নামে এস ইউ সি কর্মী নিহত হন। যদিও দেশের 'বুর্জোয়া' কাঠামোর কোনো বদল হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা কাঠামোটির বদল ঘটেছে ততদিনে। পরপর তিনটি বিধানসভার নির্বাচনে জিতে সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট তখন রাজ্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে রাজত্ব করছে। বাস বা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি তখন কোনো জনবিরোধী পদক্ষেপ নয়। বরং পুলিশের গুলিতে এসএউসি কর্মীরা হতাহত হলে এক সময়ের আগুনখোর বিপ্লবী নেতা জ্যোতি বসু নিরাসক্তভাবে বলতে পারেন— 'ওরা পুলিশের দিকে ইট ছুঁড়লে পুলিশ কী রসগোল্লা ছুঁড়বে?' অর্থাৎ পুলিশ

তখন নয়া-বিপ্লবী শক্তির সহযোগী। তার গুলি চালনাও তাই যথার্থ। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ এই ৩৪ বছর বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ নীতি বার বার সমালোচনার মুখে পড়েছে। বিরোধী দলগুলো পুলিশের বাড়াবাড়ির অজস্র অভিযোগ তুলেছে। ১৯৯৩ সালে যুব কংগ্রেসের ডাকে মহাকরণ অভিযানে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালানোয় ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী নিহত হন। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই। ২০০৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটায় আইন অমান্য আন্দোলন করার সময় ৪ জন ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী পুলিশের গুলিতে মারা যান। দুই বাম শাসকদল এর পিছনে কোনো দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া শক্তির কালো হাত খুঁজে পায়নি বলে তেমন সমালোচনা কিংবা পালটা আন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি। বাঙ্গলার রাজনীতিতে সামান্য বুদবুদ উঠলেও তেমন উথাল পাথাল হয়নি। কোনো খেলোয়াড়ই সেমসাইড গোল করে বসলে ভুলে যেতে চায়। এছাড়া পরিস্থিতি অনেক বদলেছিল। পুলিশের মাইনেও আর একশো বারো টাকায় আটকে ছিল না। অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মতো তাদেরও মাইনে বেড়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। তবে বিতর্ক থামেনি। কারণ পুলিশি ব্যবস্থা পরিচালনার সঙ্গে প্রশাসন পরিচালনার কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত থাকে। সে কারণে ২০১১ সালে এ রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পুলিশ এবং পুলিশ ব্যবস্থা পরিচালনা নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। বরং তা চলছে সমান তালে।

১৯৭৭ সালের পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাম সরকারের আমলে পুলিশ ব্যবস্থা পরিচালনা নিয়ে প্রধান অভিযোগ ছিল রাজনীতিকরণের। শাসকদল যদি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে আরক্ষাবাহিনীকে ব্যবহার করতে থাকে তবে সমাজে এই বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, সন্দেহ দেখা দেবে। কারণ পুলিশের কাজ দলমত নির্বিশেষে মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া। সমাজের একটা অংশ যদি মনে করে তারা শাসকদলের কেউ নয়। সুতরাং তারা ন্যায়বিচার পাবে না, তাহলে কেবল পুলিশ নয় প্রশাসনের অন্যান্য অংশের উপরও আস্থাহীনতা তৈরি হয়। রাজনীতির পক্ষে এটা ভালো লক্ষণ নয়। যে কোনো প্রশাসনের দুটো অংশ থাকে, একটি হলো রাজনৈতিক প্রশাসন এবং অপরটি হলো স্থায়ী প্রশাসন। সে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিরাই প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেন। প্রশাসন পরিচালনার মূল নীতিগুলো তাঁরাই ঠিক করে দেন। সেই অনুযায়ী কাজ করে স্থায়ী প্রশাসন। রাজনৈতিক প্রশাসকরা নির্বাচিত হতে না পারলে চলে যান। কিন্তু স্থায়ী প্রশাসকরা তাঁদের কর্মজীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কাজ করেন। ফলে স্থায়ী প্রশাসনের দক্ষতা, মনোবল কিংবা নিরপেক্ষতা নিয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে তবে সমাজের উপর তার মারাত্মক প্রভাব পড়ে। পুলিশ প্রশাসন এই সাধারণ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের উপর ন্যস্ত। ১৯৫৩-৫৪ সালে ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে যে হিংসাত্মক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, ১৯৫৮-৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন কিংবা ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটে সামাজিক শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশকেই নিতে হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৭৩-৭৪ পর্যন্ত সময়কালে উগ্র-বাম রাজনীতি গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়ংকর সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল তার হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়েছিল। তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন কিংবা বিতর্ক থাকলেও তাদের প্রতি সমর্থনও কম ছিল না। কারণ সমাজে বিপ্লবের নামে যারা সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছিল তারাও সাধুপুরুষ ছিল না। তাদের প্রতি সমাজের একটা বড়ো অংশের কোনো সজাগ সহানুভূতি ছিল না। এখনো নেই।

১৯৭৭-২০১১ সময়কালে বাম সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল পুলিশের রাজনীতিকরণ। ২০১১ সালের পর এ রাজ্যের একটি বড়ো অংশের মানুষের আশা ছিল রাজ্য সরকারের পুলিশ নীতিতে বদল আসবে। পুলিশ বাহিনীকে এমনভাবে গড়ে তোলা হবে যাতে এ রাজ্যে সাধারণ মানুষ নিরাপদ বোধ করে। কিন্তু একের পর এক এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যাতে পুলিশি ব্যবস্থর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা আরও বাড়ছে। মিডিয়ার দৌলতে সব ঘটনাই এখন কোটি কোটি মানুষ দেখে ফেলছে। ২০১৪ সালে আলিপুরে শাসকদলের সমর্থকের হাত থেকে বাঁচতে পুলিশকে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিতে দেখা গেছে। ২০১৭ সালে বীরভূমে শাসকদলের 'ডাকসাইটে' নেতার প্রকাশ্যে পুলিশকে হুমকি কিংবা মানুষকে পুলিশের দিকে বোমা ছুঁড়তে বলা এ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই ঘটনাপ্রবাহেরই সর্বশেষ সংযোজন গত ২৮ এপ্রিল হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় লকডাউনের সরকারি নির্দেশ কার্যকরী করতে গিয়ে প্রায় ২০০ জনের এক উন্মত্ত জনতা কর্তৃক পুলিশের ওপর আক্রমণ, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর প্রভৃতি। মিডিয়ার দৌলতে সেই দৃশ্যও এখন এ রাজ্যে মুখোরোচক আলোচনার বিষয়।

লকডাউন কার্যকরী করতে গিয়ে অনেক রাজ্যে পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে। কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরে পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে, পঞ্জাবের পাতিয়ালায় পুলিশের ওপর ভয়ংকর আক্রমণ হয়েছে, উত্তর প্রদেশেও পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে। পুলিশ পালটা ব্যবস্থাও নিয়েছে। অনেক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। টিকিয়াপড়াতেও অনেক দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু তবু পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসন ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এতো আলোচনা কেন? কারণ অনেকদিন ধরেই, প্রায় বিগত পাঁচ দশক ধরে পুলিশ প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক প্রশাসকদের প্রভাব এবং তার মাত্রা ও চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এ সম্পর্কে পুলিশের মনোবল আবার শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো সম্ভব হবে তো? দুষ্কৃতীদের দ্বারা পুলিশের ওপর আক্রমণ নতুন কোনো ঘটনা নয়। এ ঘটনা ঘটে। হয়তো ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ হলো পুলিশ এক্ষেত্রে পালটা ব্যবস্থা নেয় কী না কিংবা পুলিশকে পালটা ব্যবস্থা নিতে দেওয়া হয় কী না। টিকিয়াপাড়ার ঘটনায় ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা পার পেয়ে যান। আর রাজনৈতিক বিরোধী হলে তার উপর খড়্গ নেমে আসে। শুধু পুলিশ প্রশাসন নয়, সাধারণ প্রশাসনের সমস্ত অঙ্গগুলিকেই তৈরি করা প্রয়োজন তাদের সামাজিক ভূমিকার কথা মাথায় রেখে। বহুদিন এদিকে নজর দেওয়া হয়নি। আগামী দিনে এই বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতির স্বার্থে। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

করোনা মহামারীর সময়েও মোদী বিরোধীরা রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডায় ব্যস্ত : নাতাশা রাঠোর

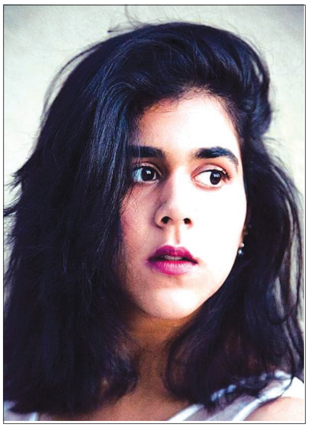

নতাশা রাঠোর বলিউডের সঙ্গে যুক্ত এবং শাহরুখ খানের জনপ্রিয় সিনেমা 'দিলওয়ালে দুল্‌হনিয়া লে যায়েঙ্গে'র উপর নির্মিত ডকুমেন্টারির মাধ্যমে বহু আলোচিত ও জনপ্রিয় চরিত্র। লন্ডন ফিল্ম স্কুল থেকে 'ফ্লিম মেকিং' প্রাপ্তা নতাশা ইদানীংকালের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে এই প্রথম রাজনৈতিক বিষয়ের উপর নিজের মতামত দিয়েছেন। করোনা সমস্যা এবং হাল আমলের ঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাক্রম নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে ঘৃণ্য প্রচার চালানো হচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে তিনি এক এক করে ৬৯ টি টুইট করেছেন। এই টুইটগুলি যথেষ্ট গবেষণা ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা এবং একই সঙ্গে এক গভীর অনুভূতির উদ্রেককারী। এখানে সেইসব টুইট (https:/twutter.com/natashjarathore) একত্র করে একটি প্রতিবেদন রূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হলো।

এই লেখাটি নিজ দায়িত্বে পড়বেন। এটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক এবং সম্ভবত 'রাজনৈতিকভাবে অসম্পূর্ণ' প্রতিবেদন। আমি এই প্রথম নিজের রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করছি। এর আগে আমি কখনও নিজের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করিনি। কিন্তু আজ জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে উঠছে এবং আমি মনে করি করছি যে এই সময়ে নিজের মতামত দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। যদি আপনারা আমার সমস্ত লেখাটি পড়ার পরও আমার বক্তব্য বুঝতে ব্যর্থ হন, তাহলে অনুগ্রহ করে এখানে নিজেদের ঘৃণ্য প্রচার ও নেগেটিভ মন্তব্য করবেন না। এই মুহূর্তে আমার সময় ও শক্তি কোনোটাই নেই এবং আপনাদের সঙ্গে কোনো বিতর্কে যাওয়ার মতো মনের অবস্থা ও ইচ্ছা নেই । আপনারা আমাকে এড়িয়েও যেতে পারেন।

জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত সংকটের সময়, এমন একটা সময় হয়ে থাকে যখন কোনো ব্যক্তির অভিসন্ধি এবং অভিলাষ ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে। এটি এমন একটি সময় যে সময়েই আমাদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমার মতে এই যে, যখন একদিকে বৃহৎ সংখ্যার বোধহীন বিদ্রূপ(ট্রোল), গুন্ডা ও একইসঙ্গে অন্ধ ভক্তদল যারা যে-কোনো প্রকারে নিজেদের ধর্মীয় ও কট্টরপন্থাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় মত্ত, অন্যদিকে তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী' ও 'জাগ্রত' সম্প্রদায়রূপে পরিচিতের এক বড় অংশ মোদীর প্রতি ঘৃণাগ্রস্ত। সেক্ষেত্রে আপনি এরূপ দুই প্রান্তের চরম মতবাদীদের সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে চলতে পারবেন? আপনি আসল পথটি কীভাবে ঠিক করবেন?

জিন শার্প নামে এক আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী, যিনি একটি সরকারকে গদিচ্যুত কীভাবে করা যায় তার উপর বই লিখেছেন। এই বইতে তিনি অহিংসা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে শাসক দলের সরকারকে কীভাবে গদিচ্যুত বা নতিস্বীকার করানো যায় তার ১৯৮ রকমের পন্থার উপায় দেখিয়েছেন। তার মতে শাসকের বিরুদ্ধে কার্যকর আন্দোলনে শান্তি এবং একইসঙ্গে গণতন্ত্রের কথাও বলে যেতে হবে। এভাবে সরকারকে এমন পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে যাতে সমস্ত ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে যায়। অবশেষে সরকারকে শক্তিশালী রাখার সমস্ত ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যাবে, ফলে সরকার পড়ে যাবে। মিশরে তহরিরচকে এইরকম কিছু পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছিল। আবার ইউক্রেনে রাশিয়ার বিরুদ্ধেও এইরকম কিছু করা হয়েছিল। এই পদ্ধতিতেই হংকঙে ৭৬ দিন ধরে তাণ্ডব চালানো হয়েছিল। এই পন্থাগুলির অর্ন্তগত কিছু কায়দাগুলি এইরূপ যেমন, পুলিস ও সুরক্ষাবাহিনীর উপর পাথর নিক্ষেপ, যাতায়াতের পথ কেটে দেওয়া, রাস্তায় ভিড় জমিয়ে রাখা যাতে দমকলের গাড়ির চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, অন্যস্থানে

আগুন নেভাতে যেতে না পারে। বিক্ষোভ প্রর্দশনে সকলের আগে শিশু ও মহিলাদের দাঁড় করিয়ে রাখা, এছাড়া অ্যাসিড ছোঁড়া, পেট্রোল বোমা মারা, মিডিয়ার মাধ্যমে ক্রমাগত নেগেটিভ অভিযান চালানো, অসত্য খবরের ব্যাপক প্রচার করা, জনগণকে বিপথে চালনা করা এবং নিজ দলের সমর্থকদের দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ভড়কানোর ষড়যন্ত্র করে কারাবরণ করা ইত্যাদি এগুলির মধ্যে রয়েছে।।

সম্প্রতি দিল্লিতে ঘটা দাঙ্গার আড়ালে যা কিছু হলো সেই প্রসঙ্গে যদি দেখা হয় তবে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সরকারকে বিচলিত করার এই রাজনৈতিক পন্থাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। আরও গভীরভাবে ভাবলে বুঝতে পারা যায় যে এগুলির পেছনে বা অন্তরালে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত এবং 'সচেতন' লোকেদের হাত ছিল।

জিন শার্প সরকার ফেলে দেওয়ার যে পদ্ধতিগুলির তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে দিল্লির ঘটনায় কমপক্ষে সত্তর আশিটি এক্ষেত্রে সরাসরি প্রয়োগ করা হয়েছে। দিল্লিতে ইদানীং যা কিছু ঘটেছে, সিএএ-র সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই এবং বাস্তবে মুসলমানদের স্বার্থের সঙ্গেও জড়িত নয়। আমাদের এটা বোঝা দরকার যে, এই দেশের বিশাল আকার এবং জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রশ্নতোলা অমূলক। ফ্রান্স, পর্তুগাল, ব্রিটিশ ও মুঘল শাসনকালের শেষেও ভারতবর্ষ শুধু তার অস্তিত্ব টিকিয়েই রাখেনি, অতিরিক্ত নিজ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারাবাহিকতার নীতিকে স্পর্শ করতে দেয়নি। সুতরাং মুষ্টিমেয় ভণ্ড হিন্দু গুন্ডার ভয়ে ভীত হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে কি?

সবচেয়ে চিন্তার বিষয় এই যে এই দেশ শত শত বছর ধরে লুঠ হয়ে এসেছে। একে কয়েক দশক পর্যন্ত তৃতীয় দুনিয়ার দেশ করে রাখা হয়েছে। দশকের পর দশক ধরে ভ্রষ্টাচার ও পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির রমরমা হয়ে এসেছে। এর থেকে আরও চিন্তার বিষয় হলো যে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবী লোকেরাও ভ্রান্ত প্রচারের শিকার হয়ে উঠছে। আমি এবিষয়ে একমত যে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় অসার পর আর এস এসকে গুন্ডাবাহিনী হিসেবে বিদ্রূপ করার প্রবণতা বেড়ে গেছে, কিন্তু আপনারা ভেবে দেখুন যে মোদীকে নীচু দেখানোর যে রাজনৈতিক খেলা চলছে তা ভারতের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বুনিয়াদের জন্য আরও ক্ষতিকর।

নেতৃত্বের বিষয়ে অল্প স্বল্প খবর রাখেন এমন কোনো ব্যক্তি এটা বোঝে যে একজন নেতা হওয়ার প্রথম শর্ত হলো আপনি কতটা নিজের দলের সকলকে নিয়ে চলতে পারেন, হতে পারে এরা দায়িত্বহীন অথবা অক্ষম, তবুও পরিশেষে এটা টিম ওয়ার্ক হিসাবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তি ভালো 'টিম প্লেয়ার' হওয়ার ব্যাপারে যেটা বোঝে সেটা হলো নিজের পছন্দের কর্মসূচি যাই হোক না কেন, নিজের ভুলের জন্য আপন দলের সদস্যদের দোষারোপ করে না, বিপরীতে সে এই দুর্বলতাকে আড়াল করেই এগিয়ে চলে। কিন্তু তবুও মোদীর এতো বিদ্বেষী কেউ কেন হবে? ভারত কয়েকদশক ধরে ভ্রষ্টাচার এবং পরিবার তন্ত্রের রাজনীতির জালে ফেঁসে আছে। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে এর উদাহরণ আপনাদের জানাচ্ছি। আমার বাবা ১৯৯৮ সালে গ্যাসট্রোএনটেরোলজিস্ট হিসাবে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য মুম্বাই চলে গিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম চিকিৎসক যিনি ভারতে প্রথম এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড চিকিৎসার শুরু করেছিলেন। ১২ হাজার টাকা প্রতিমাসে রোজগার দিয়ে শুরু করা থেকে মুম্বই শহরের কেন্দ্রস্থলে গ্যাসট্রোএনটেরোলজি হাসপাতাল স্থাপন করত এক সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। কিন্তু তাঁর এই চলার পথ মসৃণ ছিল না। বহুবছর ধরে সমস্ত ডাক্তার এর বিরোধিতা করে এসেছেন, তাঁকে হত্যার ধমক এবং শারীরিক লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং আপনারা বিশ্বাস করবেন না তবুও জানাই একবারতো তাঁর সাহায্যকারীদের খুন করতে কিছু গুন্ডাও পাঠানো হয়েছিল। জানতে চান কেন এমন করা হয়েছিল, কারণ ভারতের ক্ষেত্রে এটা ঘটনা যে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে এমন নেতা ছিলেন না যিনি ভারতের নব্বই শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইতিপূর্বে আমাদের কখনো এমন নেতা আসেননি যিনি চা-ওয়ালা ছিলেন, যিনি এমন সামাজিক-আর্থিক স্তর থেকে আগত যে সাধারণ ভারতবাসীর সমস্যা বোঝেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বুঝতে পেরেছেন যে ভারতের পরিবর্তনের জন্য কোনো নতুন

মোদীজী দেশে এখনও পর্যন্ত যে সকল বিষয়ের প্রচলন করেছেন এবং যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত কিছু বদলে যাচ্ছেন, যেভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি মোকাবিলা করছেন এবং জনগণের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছেন সে সবই অত্যন্ত প্রশংসনীয়।... মোদীজীকে কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা নয়, ১৩০ কোটি জনগণ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তিনি আজও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইনি মাটির ঘড়া নন, ইনি অপরিণত ব্যক্তিও নন।

আইনের প্রয়োজন নেই, দরকার শুধু মানসিকতার। মোদীজী দেশে এখনও পর্যন্ত যে সকল বিষয়ের প্রচলন করেছেন এবং যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত কিছু বদলে যাচ্ছে। যেভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি মোকাবিলা করছেন এবং জনগণের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছেন সে সবই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একমাত্র তিনি এখনও অর্থব্যবস্থার মন্দা কাটিয়ে উঠতে পানেননি। যদিও এরজন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যৎই বলবে সেগুলি বাস্তবে ফলপ্রসূ হয়েছে অথবা ব্যর্থ। এটা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান দুনিয়াতে যদি কোনো অর্থনীতির প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা 'কোভিড' পরবর্তী সময়ে দ্রুতলয়ে বিকশিত হবে তা হলো ভারতীয় অর্থনীতি, তার একমাত্র কারণ ভারতীয় অর্থব্যবস্থার নব্বই শতাংশ আত্মনির্ভর।

কয়েকদিন হলো এমবিবিএস এবং এমডি চিকিৎসক এবং লেখক ডাঃ শরদ ঠাকরের গুজরাতিতে এক অডিয়ো ক্লিপ আমার হাতে এসেছে যেখানে কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে মোদীজীর 'প্রো-কোভিড' আলোচনা হয়েছে। তিনি মোদীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ''ইদানীং কী রকম চলছে?'' ডাঃ শরদ আরও জানাচ্ছেন যে এইরকম ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেওয়ার রেওয়াজ যেমন, ' সব ঠিক আছে' কিন্তু মোদীজী এক্ষেত্রে কিছুক্ষণ মৌন থেকে গম্ভীরভাবে উত্তর দেন যে, 'সাধনা'। ডাঃ শরদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন 'কী রকমের সাধনা'? এর উত্তরে মোদীজী বলেন 'ঘুমের উপর নিয়ন্ত্রণের সাধনা'। তখন ডাঃ শরদ আবার প্রশ্ন করেন, ''আমি শুনেছি যে আপনি আগের থেকে খুব কম সময়েই ঘুমোন, এর পরও আপনি আর কত ঘণ্টা কমাতে চাইছেন?'' মোদীজীর গম্ভীর উত্তর ছিল 'আমি একেবারেই ঘুমতে চাই না'। জনগণের সম্ভবত বিশ্বাস করা কঠিন হবে তবু তিনি আরও বললেন যে ''আমি এটা বুঝতে পারি, কারণ আমি নিজে সাধনা করি এবং সাধনার দ্বারাই ঘুমের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব। বলা হয় বীর হনুমান কখনো ঘুমাতো না''। ডাঃ শরদ তাঁকে আরও একটি প্রশ্ন করেন, ''কিন্তু আপনি এমন কেন করতে চাইছেন?'' মোদীজীর উত্তর 'এই রাষ্ট্রের জন্য এবং গরিবদের জন্য। এটি এক মহান দেশ, কিন্তু আমাদের লুঠ করা হয়েছে এবং এই দেশকে ঠিক করে তোলা আবশ্যক হয়ে পড়েছে, এরজন্য কুড়ি ঘণ্টা খুব কম সময়, আমার পুরো চব্বিশ ঘণ্টাই দরকার।'' একথা বলার সময় মোদীজীর চোখে জল এসেছিল এবং এটা শুনতে শুনতে ডাঃ শরদের চোখেও জল এসে গিয়েছিল।

মোদীজী তাঁর হিমালয়ে অতিবাহিত দিনগুলির কথা বললেন, তাঁর দূরদৃষ্টির বিষয়েও বললেন। মোদীজী বলেছেন যে তিনি সন্ন্যাসী না হওয়ার নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং দেশের সেবা করার আদেশ পেয়েছিলন যার জন্য তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। ডাঃ শরদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ''এখনতো বহুলোক আপনার পেছনে লেগে গেছে। আপনি হিট লিস্টে সবার ওপরে রয়েছেন, কিন্তু আপনার ভয় হয় না?'' মোদীজীর উত্তর ছিল, ''এটা আমার জীবনের উদ্দেশ্য যে এই রাষ্ট্রের সেবা করে যাবো, যতদিন না আমার উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে কেউ আমাকে হত্যা করতে পারবে না, আর একবার আমার উদ্দেশ্য ও অভিলাষ পূর্ণ হয়ে গেলে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই'না। আমি এখানে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই রয়েছি।'' ডাঃ শরদ জানাচ্ছেন আমি চোখ বন্ধ করে কাউকে অনুসরণ করি না। যখন আমি মাটির ঘড়া কিনতে বাইরে যাই, তখন টোকা মেরে পরখ করে নিই যে সেটা কাঁচা আছে, না পাকা। ইনি মাটির ঘড়া নন, ইনি একজন ব্যক্তি যাঁকে বহুবার পরীক্ষা দিতে হয়েছে, পরখও করা হয়েছে। মোদীজীকে কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা নয়, ১৩০ কোটি জনগণ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তিনি আজও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইনি মাটির ঘড়া নন, ইনি অপরিণত ব্যক্তিও নন।

চীনের হুবেই প্রদেশে লকডাউনের সময় হিংসাত্মক বিক্ষোভ প্রদর্শনের ভিডিয়ো এবং টুইটগুলি চীনা সরকার দ্বারা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, অন্যদিকে ভারতের হাজার হাজার প্রবাসী শ্রমিকদের ভিডিয়ো এবং ভারত সরকারের সমালোচনার বহুসংখ্যক টুইট আজও ইন্টারনেটে বজায় রয়েছে। মোদী সরকার যদি সত্যিই ফ্যাসিবাদী, যেটা বিরোধীরা বলে থাকে, তবে কি এসব করার করার স্বাধীনতা এরা পেতো? মোদী সরকারের ছয় বছর হয়ে গেছে আর যদি তিনি সম্পূর্ণরূপে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চাইতেন, যদি সত্যিই তাঁর এরকম মনস্কামনা থাকতো তবে এতেদিনে তা সম্পূর্ণ হয়ে যেতো। আমেরিকা থেকে আমার এক বন্ধু আজ সকালে আমাকে একটি ভয়েস নোট পাঠিয়েছেন। তিনি ''নাতাশা আমি দেখতে পাচ্ছি যে সব জায়গার লোকেরা সরকারের সমালোচনা করছে, কিন্তু ভারতে কিছু লোক যেভাবে টুইট করে সরকার বিরোধিতায় উদ্যোগী হয়ে নীচতার সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে, সেটা আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।'' ভারতে টুইটারে প্রবলভাবে নেতিবাচক ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। আজও এরা টুইটার ও পোস্টে আগের মতোই ট্রেন্ড করে চলেছে। আনুমানিক সাড়ে চার বিলিয়নের মতো লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যদি এদের এভাবে দিক্‌ভ্রষ্ট করতে থাকে এবং একপ্রকার ধারণার প্রচার চলতে থাকে, যেমন এই সরকার একেবারে অক্ষম, তবে জেনে রাখুন অর্ধেক কাজ হয়ে গেল।

জিন শার্পের মতে , কিছু নীতি থাকে যা কোনো সরকারকে মজবুত করে তোলে এবং তাকে দুর্বল করতে হলে আপনাকে মিডিয়ার ব্যবহার আবশ্যই করতে হবে। এতে কোনো আশ্চর্য নেই যে এই লোকেরা ধর্মগুরু এবং অন্য আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলিকেও নিশানা বানাতে শুরু করে দিয়েছে। এই দাম্ভিকদের সঙ্গে আপনি তর্ক করতে এবং এদের কাজের জালিয়াতি ধরতে পারবেন না। যার ফলে এরা এক বিশেষ গোষ্ঠীর লোকেদের দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ রাজনীতির প্রয়োগ করা শুরু করে দিয়েছে। আজকাল কিছু লোক নিজেদের টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে একদিকে যখন বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করেছে, তখন অন্যদিকে ওই ধর্মগুরুরা এখনও বিশ্বনীতিগুলির সংস্কারের জন্য কিছু চমকপ্রদ কাজ করে চলেছেন।

টুইটারে বহুসংখ্যক এমন লোক রয়েছেন যারা যন্ত্রের মতো পোস্টগুলি না পড়েই রিটুইট করে দেন, কারণ এরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন, আবার কিছুলোক রিটুইট করার জন্য টাকাপয়সাও পেয়ে থাকেন, ওই রকম কিছু লোক অস্থিরতা সৃষ্টিকারী খবর প্রচার করার জন্য উদগ্রীব হয়েই আছেন। টুইটারে ২৫ জনের একটি দল কোনো একটি টুইটকে ট্রেন্ড করার জন্য যথেষ্ট। যখন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত নেগেটিভ টুইট ট্রেন্ড করতে থাকে, ততক্ষণে পাশ্চাত্যের লোকেরা ঘুম থেকে জেগে উঠে যায় এবং তারাও এই বিষয় নিয়ে আদানপ্রদান শুরু করে দেয়। ফলে নেগেটিভ প্রচারগুলি আরও জোরদার হয়ে ওঠে। শিক্ষিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এবং গভীররাত পর্যন্ত জেগে থাকা কলেজ পড়ুয়ারা এদের শিকারের লক্ষ্যস্থল। কেউ ফ্যাসিবাদ চায় না , চায় না কোনোপ্রকার ধর্মীয় উন্মাদনা বা কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক লড়াই। সমাজে রক্তপাত হোক কেউই কেউ চায় না।

আজ লাকডাউনের চতুর্থ দিন, ভারতে আজ পর্যন্ত এক হাজারের বেশি মামলা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে হাজারেরও বেশি প্রবাসী শ্রমিক নিজের নিজের গ্রামে গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য রাজপথে বেরিয়ে এসেছে, আবার কিছু লোকেদের ডিটিসির বাসে করে দিল্লির সীমান্তে এনে নিজেদের ভাগ্যের ভরসায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত যখন করোনার মতো মহামারীর সঙ্গে লড়াই করে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে চলেছে, সেখানে লেখাপড়া জানা অশিক্ষিত, সত্যিকারের অশিক্ষিত, হোয়াটসঅ্যাপে মিথ্যা

খবরের প্রচার, বিদ্বেষপরায়ণ বুদ্ধিজীবী এবং শঠ নেতাদের জন্য দেশকে আরও বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গতসপ্তাহে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী হাতজোড় করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের এই গভীর সমস্যার সময় নিজ নিজ কর্মচারীদের বেতন দিয়ে যেতে এবং তাদের দেখাশোনা করার আবেদন জানিয়েছেন। তবুও কোরোনা ভিলেনে (#Corona Villains)-এ এক মহিলার দুবার পোস্ট করা ভিডিয়োর মতো আরও ভিডিয়ো প্রকাশ করা হচ্ছে যেখানে বলা হয়েছে 'এই তিন সপ্তাহের জন্য আমার পরিচারিকার পারিশ্রমিক কে দেবে? আপনারা কি বেতন দিয়ে দিচ্ছেন? প্রধানমন্ত্রী কি ওর বেতন দিয়ে দেবেন? সে সুস্থই আছে, ওর কিছু হয়নি, সুতরাং সে কাজ করতে আসবে।' দুর্ভাগ্য যে, অধিকাংশ ভারতীয় নিয়োগকর্তাদের এই একই মানসিকতা, যার ফলস্বরূপ বেশকিছু পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর রাষ্ট্রীয় টিভি চানেলে হাত জোড় করে অনুরোধ করেছেন 'দয়া করে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখুন এবং যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। নিজের গ্রামে ফিরে যেতে হবে না।' এতৎসত্ত্বেও এখনও দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্তে জনসমাগম দেখা গেল। এটা মেনে নিতেই হয় যে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়নি তো? কিছু লোকের মন্তব্য যে সরকার দ্বারা লকডাউন ঘোষণার আগে তার ফলশ্রুতি নিয়ে ভাবা উচিত ছিল। ঠিক আছে, আমরা এটা স্বীকার করে নিচ্ছি, কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে হাতে সময় একেবারেই ছিল না এবং ওই মুহূর্তেই লকডাউন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। বাস্তবে করোনার মতো মহামারীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে এই পদক্ষেপের ঘোষণা সঠিক সময়েই করা হয়েছে। যদি লকডাউন আরও কিছুদিন আগেই করা হতো তবে আমরা আরও সমস্যায় পড়তাম এবং হাঁফিয়ে উঠতাম। অন্যদিকে এই ঘোষণা আরও কিছুদিন পরে করা হলে তখন অবস্থা আমাদের হাতের বাইরে চলে যেত।

প্রশ্ন যে সরকার কি এই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য স্টেডিয়ামে 'রেন বসেরা' (অস্থায়ী বাসস্থান) তৈরি করে দিতে পারতো না? এটা সুনিশ্চিত যে সেটা একটা উত্তম পদক্ষেপ হতে পারতো, কিন্তু এটাতো সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর উদ্দেশে ঘোষণা করার পরও কেউ এরূপ অব্যবস্থার চিন্তা করতে পারেনি। প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা ভেবে কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা থেকে চিকিৎসা পরিষেবা এবং আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করা থেকে দৈনন্দিন সামগ্রীর জোগানের ব্যবস্থা করা, আইন কানুনের নিয়ন্ত্রণ করা পর্যন্ত কোনো বিষয়েই সরকার কোনো ত্রুটি রাখছে না। হাজার শয্যার হাসপাতালের নির্মাণে চীনের দশদিন লেগেছে, যেখানে ভারতে ভারতীয় রেল রাতারাতি ছ'হাজার শয্যার সুবিধা বিশিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ডে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। ভারতের মতো দেশে এই মহামারীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে যে ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যোজনা নেওয়া হয়েছে তা এক অভূতপূর্ব এবং ঐতিহাসিক ।

প্রকৃতপক্ষে পরিযাযী শ্রমিকরা মিথ্যা প্রচার এবং ফেক নিউজের বলি হয়েছে। কিছু শ্রমিক জানিয়েছে যে তাদের ডিটিসি বাসের ভুল নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে আনন্দ বিহার থেকে নিজেদের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই সবই যেন 'জিন শার্প ১০১'-এর পদ্ধতি অনুসারে করা হয়েছে। বিভ্রান্তিকর প্রচার করা হয়েছে এবং অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই মহামারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের আয়তন, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং জনগণের বোধবুদ্ধির খেয়াল মাথায় রেখে যা কিছু করা যেতে পারে সে সবকিছুই করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, বেশি করে যা চর্চা হচ্ছে সেগুলি একেবারেই অসত্য। দিল্লির ঘটনা এটা আবার প্রমাণ করলো যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একাধিক শক্তি রয়েছে, যারা মোদী সরকারকে বিফল হওয়া দেখতে পচ্ছন্দ করে, তার জন্য যদি নাগরিক ও দেশকে মূল্য দিতে হয় তাহলেও তাদের কিছু যায় আসে না।

ভারতীয় রাজনীতিতে আজ যা কিছু ঘটছে তা রাজনীতির জন্য এক ট্রাজেডি, আর সবচেয়ে মর্মান্তিক যে মানবতার জন্যও এক ট্রাজেডি। ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা যথেষ্ট ভালো নয়, পরীক্ষার জন্য কম 'কিট', দারিদ্র্য, অনুশাসনহীনতা, অব্যবস্থা এবং অবৈজ্ঞানিক চিন্তার জনসংখ্যা ইত্যাদির মতো সমস্ত রকমের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও মোদীজী একসপ্তাহের মধ্যে দেশে যা করে দেখিয়েছেন তা কল্পনাতীত, অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব। পরিবেশব সংক্রান্ত কয়েকটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে উন্নত দেশের শক্তিশালী নেতাদের সামনে মোদীজী সুস্পষ্ঠভাবে পরিবেশ রক্ষায় ভারতের মতামত দিয়েছেন। তিনি পরিবেশ নিয়ে ছেলেখেলায় মত্ত কয়েকটি উন্নত দেশকে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে 'মানষের জীবনের মূল্য অর্থনীতির থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"এই সিদ্ধান্তকে মূলমন্ত্র মেনে নিয়ে কর্মসূচি তৈরি করার পরও টুইটারে #Modi Made Diaster ট্রেন্ড করা হচ্ছে এবং প্রচার করা হচ্ছে যে মোদী একাই ভারতকে #COVID19-এর তৃতীয় স্টেজে ঠেলে দিচ্ছেন।

ভারতে আজ যে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বিরোধীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। এটাও তথ্যনির্ভর সত্য যে বিরোধীরা মোদীজীর সফলতাকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। এরা মোদীজীর ভাবমূর্তিকে ধুলিসাত করার জন্য যে-কোনো পর্যায়ের চেষ্টা করে যেতে পারে, হোক না সেগুলি মানুষের জীবনের বিনিময়ে। এটা এমন একসময় যখন লোক মরছে, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে ঝুলে রয়েছে। এই সময় দেশের পাশে দাঁড়াবার সময়, কিন্তু এই সময়েও বিরোধীরা মোদীকে নীচু করে দেখাতে দেশের সবচেয়ে দুর্বল অংশকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছে না। এরা সেই শ্রেণীর রাক্ষস যাদের দেশের মানুষ ভোট দিয়েছেন।

আজ আমি আনন্দিত যে অমিত শাহ নির্বাচন নিজের পরিকল্পনায় জিতেছেন। যদি এটা মেনে নিতে হয় যে নির্বাচনে অনিয়ম করা হয়েছে তা হলেও। যদি আমি তাঁর জায়গায় থাকতাম তবে এটাই করতাম, কেননা আর কিছু না হোক অন্তত এই রাক্ষসদের দেশের ওপর প্রভুত্ব করতে দিতে পারতাম না। আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলছেন, বাস্তবে আমরা এর যোগ্যই নই। আমাদের এক এমন নেতার দরকার যিনি সমস্ত কিছু সরাসরি চালু করতে পারেন এবং প্রয়োগ করতে পারেন। এখন অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে রাষ্ট্রবাদী হওয়ার অর্থ কী। আজ বুঝতে পারছি প্রকৃত রাষ্ট্রবিরোধী কারা ! আজ আমার নিজ নেতার প্রতি গর্ব হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সংযম, সাহস, ধৈর্য বজায় রাখা এবং বিজয়ী হওয়া বিরল শ্রেণীর লোকেদের দ্বারাই সম্ভবপর। আজ আমি মোদীজীর সমস্তরকম পদক্ষেপের জন্য কৃতজ্ঞ যে তিনি এই মহামারীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে এবং সমস্ত ভারতীয়দের সুরক্ষার জন্য সমস্ত রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সেই সঙ্গে আমি লজ্জিত যে মোদীজীকে এই সকল অনুধাবন করে আগেই কেন সমর্থন করতে পারিনি আমার লেফ্ট-লিবারেল বন্ধুরা কিছু মনে করতে পারে সেই ভেবে। কিন্তু আজ আমি প্রকাশ্যে মোদী সরকারকে সমর্থন করছি। আজ আমাকে তাঁর ভক্ত বলতে পারেন, এরজন্য যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাকে ব্রাত্য হতে হয় আমি তার পরোয়া করি না। ■

করোনার ভয়াবহ তাণ্ডবেও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা, জবরদখল চলছেই

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ।। ভয়ংকর করোনার আঘাতে বাংলাদেশ-সহ গোটা বিশ্ব যখন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধুঁকছে, প্রতিদিনই মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তার মধ্যেও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা, জমি জবরদখল, হিন্দু মেয়েদের জোরপূর্বক অপহরণ ও ধর্মান্তরিত করা, মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাংচুর থেমে নেই। করোনায় লকডাউনে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ত্রাণ বিতরণ করা হলেও বিভিন্নস্থানে হিন্দুরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এই হামলা ও ত্রাণ বিতরণে বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে স্মারকলিপিও পেশ করা হয়েছে। ঐক্য পরিষদ বলেছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে হরিজন, জেলে, দলিত, রবিদাস, জনজাতি এবং করোনার কারণে দুঃস্থ ও কর্মহীন সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণে বৈষম্য করা হচ্ছে।

এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে হিন্দুদের ওপর হামলা, হিন্দু মেয়েদের অপহরণ ও ধর্মান্তরিত করা, মন্দিরে হামলা ও ভাংচুর এবং জায়গাজমি জবরদখলের যেসব ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো।

ভারতে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ।। সাতক্ষীরায় ব্যবসায়ী সুবল চক্রবর্তীকে কলেমা পড়ে মুসলমান না হলে ভারতে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত তালা উপজেলার নগরঘাটায় কালিপদ চক্রবর্তীর ছেলে মুদি দোকানদার সুবল চক্রবর্তীকে গত ১৩ এপ্রিল সোমবার প্রকাশ্যে সবার সামনে মারধর করা হয় এবং কলেমা না পড়লে ভারতে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে দক্ষিণ নগরঘাটা গ্রামের আব্দুর রহিম সরদারের ছেলে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী মোস্তাক। সে হুমকি দিয়ে বলে, হয় কলেমা পড়ে মুসলমান হও তা না হলে ভারতে চলে যাও। এই ঘটনার পর এলাকার কয়েকশো হিন্দু পরিবার শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ভুক্তভোগী সুবল চক্রবর্তী নগরঘাটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান লিপুকে জানালেও তিনি কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় পাটকেলঘাটা থানায় তিনি একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বসতবাটি থেকে উচ্ছেদ করতে হামলা ।। গত ২৪ এপ্রিল বাগেরহাটে একটি হিন্দু পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করতে হামলা চালানো হয়েছে। ওইদিন সকালে মোংলা থানার অন্তর্গত চিলা ইউনিয়নের গোলেরডাঙ্গা গ্রামের অনিলা বালার পরিবারের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায় পার্শ্ববর্তী বাঁশতলা গ্রামের প্রভাবশালী সন্ত্রাসী-ভূমিদস্যু আবদুস ছালামের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত। এতে অন্তঃসত্তা গৃহবধূ সুমিতা বালা, অনিল বালা, মায়া বালা, সরলা গোলদার, শিশু পুটু গোলদার ও শংকর গোলদারসহ ৭ জন গুরুতর আহত হন। পরে এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। অন্তঃসত্বা গৃহবধূ সুমিতা বালা ও অনিল বালার অবস্থা গুরুতর বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক। এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

শিব মন্দির দখল ।। জামালপুর জেলার মেলান্দহ থানার অন্তর্গত ঢালুয়াবারি গ্রামে গত ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সারাদেশে লকডাউনের সুযোগ নিয়ে মৃত সেকান্দর খাঁ-র পুত্র নুরুল ইসলাম খাঁ-র নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত একটি বহু পুরানো শিব মন্দির ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দখল করে নিয়েছে পুরো দেবোত্তর সম্পত্তি।

মন্দিরে জুয়া খেলতে বাধা দেওয়ায় হামলা ।। জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর পৌর এলাকার পারঘাটী মন্দিরে জুয়া খেলতে বাধা দেওয়ায় গত ২০ এপ্রিল কয়েকটি হিন্দু

বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। এসময় দুবৃত্তরা বাড়িঘর ভাঙচুর ও লোকজনদের মারধর করে। রাত সাড়ে ১২টার দিকে কয়েকজন মুসলমান যুবক ওই মন্দিরে জুয়া খেলছিল। এইসময় মন্দিরের পাশের বাড়ির হিন্দু লোকজন মন্দিরে জুয়া খেলা বন্ধ করতে বললে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও মারধর করে। এ ঘটনার পরপরই পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার কথা বললেও এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি। এ ঘটনায় হিন্দুরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অষ্টমীর আত্মহত্যা ।। রাজশাহীর মোহনপুর থানার অন্তর্গত ঘাসিগ্রামের নিমাই সরকারের মেয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী অষ্টমী সরকার শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে। ঘাসিগ্রাম স্কুলের সহকারী শিক্ষক শরিরত আলির সহায়তায় পাশের গ্রামের আফজাদ্বল হোসেনের ছেলে গোলাম ও তার সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে অষ্টমীকে উত্যক্ত করে আসছিল। ফলে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ট হয়ে গত ১৬ এপ্রিল অষ্টমী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ইতোপূর্বে গত বছর ১১ নভেম্বর প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সময় গোলাম মোস্তফা ও তার সহযোগীরা অষ্টমীকে অপহরণ করেছিল। খবর পেয়ে ওইদিনই পুলিশ অষ্টমীকে উদ্ধার ও অপহরণকারী গোলাম মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠায়। কিন্তু জামিনে বেরিয়ে এসে আবারও অষ্টমীকে উত্যক্ত করতে শুরু করে। শেষে আর সহ্য করতে পারেনি অষ্টমী, বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ।

জায়গাজমি দখল করতে হামলা ।। করোনার কারণে দেশজুড়ে লকডাউনের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের শুক্লদাস পাড়ায় গত ২১ এপ্রিল স্থানীয় প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতার নির্দেশে এলাকার সন্ত্রাসী মহাম্মদ রাশেদ, মহম্মদ আব্দুল্লাহ, জিয়া উদ্দিন, হাবিবুল্লাহ ও মুসা উদ্দিন-সহ সন্ত্রাসীরা ৩০টি হিন্দু পরিবারের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় এবং তাদেরকে দেশত্যাগের হুমকি দেয়। হামলায় নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছে। গুরুতর অবস্থায় বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করে তাদের জায়গাজমি দখল করাই ছিল এই হামলার উদ্দেশ্য। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে শঙ্কা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলাম অবমাননার গুজব রটিয়ে হামলা ।। ইসলাম নিয়ে ফেসবুকে বিরূপ মন্তব্য ও ধর্ম অবমাননার মিথ্যা গুজব রটিয়ে কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার কালিগঞ্জ ইউনিয়নের সাতানী হাইল্লা গ্রামের পূর্ণচন্দ্র সরকারের ছেলে অনার্সের ছাত্র পরিতোষ কুমার সরকারের ওপর হামলা চালানো হয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় লোকজন। এ ঘটনায় এলাকায় হিন্দুদের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে।

দেশত্যাগে বাধ্য করতে হামলা ।। গত ১৭ এপ্রিল চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার ৯নং ইউনিয়নের নলুয়া গ্রামে শীতল সরকার ও তার ভাই হীরাপদ সরকারকে কয়েক দফা মারধর করে প্রতিবেশী মুন্সী বাড়ির সন্ত্রাসী ছেলে রাকিব হোসেন। শীতল ও হীরাপদ গুরুতর আহত হয়। তাদের চিৎকার শুনে এসে দ্রুত লোকজন ছুটে এসে তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করান। দীর্ঘদিন যাবৎ সন্ত্রাসী রাকিবের নেতৃত্বে রিপন, বক্কর, হাসান, মকবুল মাহবুব, মাসুমসহ ১০-১২ জনের একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ এলাকার হিন্দুদের ওপর হামলা করছে, নির্যাতন চালিয়ে আসছে। তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করতেই এভাবে হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা ।। যশোর জেলার বেনাপোল পৌরসভার ছোটআঁচড়া গ্রামের রবীন সরকারের স্ত্রী রীতা সরকারকে গত ১৬ এপ্রিল রাতে শ্লীলতাহানি করে স্থানীয় আওয়ামি লিগ নেতা বাবু সর্দার। সে মৃত আকবর আলির ছেলে। রীতা প্রকৃতির ডাকে রাত ১২টার দিকে ঘরের বাইরে বাথরুমে গেলে পূর্ব থেকে ওত পেতে থাকা বাবু সর্দার তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এতে রীতা আহত হয়। বাবু সর্দারকে পুলিশ আটক করলেও স্থানীয় আওয়ামি লিগ নেতারা তার জামিনের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে আসামি গ্রামে ফিরে এসে রীতার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে রীতার পরিবার।

হামলা চালিয়ে পুকুর দখল ।। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ৬নং রমজাননগর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের ভেটখালী গ্রামের বীরন্দ্র কৃষ্ণ মণ্ডল ও তার স্ত্রী নীলিমা রাণী মণ্ডলকে গত ২৪ এপ্রিল সকালে একই গ্রামের সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য সুন্নত আলি গাজি তার ক্যাডার বাহিনীর সদস্য ইসমাইল হোসেন, রাজ গাজি, আজিম গাজি ব্যাপকভাবে মারধর করে তাদের বাড়ির পুকুর দখল করে নিয়েছে। এ সময় বীরেনবাবু ও তার স্ত্রী বাধা দিলে তাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায় ও বাড়িঘর ভাঙচুর করে জেহাদিরা। বর্তমানে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ মণ্ডল শ্যামনগর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

জমি ও বাড়ি দখল ।। গত ১৩ এপ্রিল দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার নাসিরপুর গ্রামের হিন্দু পল্লীতে হামলা চালিয়ে সুধাংশু দাসের জমি ও বাড়ি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালী ইচ্ছামিয়া ও তার সহযোগীরা। এতে স্থানীয় হিন্দুরা তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে ।

হামলার মামলা নেয়নি পুলিশ ।। গত ১২ এপ্রিল ফরিদপুর সদর উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের মল্লিকপুরের পালপাড়ায় সুরেশ পালের বাড়িতে এলাকার প্রভাবশালী সলেমান ব্যাপারীর নেতৃত্বে মিজান ব্যাপারী, মোঃ রানা ব্যাপারী, মোঃ হৃদয় ব্যাপারী ও মোঃ সুজায়েত-সহ একদল সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছে। এতে সুরেশ পাল, তার স্ত্রী সবিতা পাল, ছেলে সমীর পাল, তার ভাই জগদীশ পাল, তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সুস্মিতা পাল মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদেরকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি। সন্ত্রাসী হামলার

শিকার হিন্দু পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

জমি ও বাড়ি দখল করতে হামলা ।। কক্সবাজার পৌরসভা এলাকায় বিডিআর ক্যাম্প অধীন ৬নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ সাত্বিতা পল্লী হিন্দু পাড়া সাহা গলি রোডে অবস্থিত গোপাল দাশের বাড়িতে সার্বজনীন শিব মন্দিরের জমি ও বসতবাড়ি দখলের উদ্দেশ্যে হামলা চালায় প্রতিবেশী প্রফেসর হোসেন ও তার ছোট ভাই লিয়াকত-সহ তাদের দলবল। এই সময় তারা মন্দিরের সামনে সীমানা খুঁটি দিয়ে দখল দাবি করে, শুধু তাই নয় গোপালবাবুকে হুমকিও দেওয়া হয়। বর্তমানে হিন্দু পরিবারটি আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

জমি দখল করে ঘর তৈরি ।। পটুয়াখালী জেলার মহিপুর থানার অন্তর্গত সদর ইউনিয়নের পুরান মহিপুর গ্রামের নারায়ণ সরকারের ভোগদখলীয় ৩০ শতাংশ জমি গত ৪ এপ্রিল একই গ্রামের ভূমিদস্যু, সন্ত্রাসী রায়হান মীর, ফারুক মৃধা, কালাম চৌকিদার, জাহাঙ্গীর ও খলিল জোরপূর্বক দখল করে সেখানে ঘর তৈরি করেছে। বর্তমানে ভূমিদস্যু চক্রটি ওই পরিবারকে এলাকা ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে।

ত্রাণ পেল না ঋষিপাড়ার মানুষ ।। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরনো সড়কের পাশে ফতুল্লায় নলখালি খালের উত্তর দিকে প্রায় দুই শতাধিক হিন্দু পরিবার নিয়ে গড়ে উঠেছে ঋষিপাড়া। করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউনের কবলে পড়ে অর্ধাহারে-অনাহারে মানবেতর জীবনযাপন করছে ওই ঋষিপাড়ার মানুষগুলো। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কিংবা সরকারি কোনো মহলের লোকজনও তাদের খোঁজখবর নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে পরিবারগুলো। ওরা স্থানীয় চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান স্বপনসহ আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ও বক্তাবলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বাড়িতে ত্রাণের জন্যে গেলেও তারা আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন খালি হাতে।

গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো বাড়ি ।। গত ০৭ এপ্রিল দুপুরে বি এন পি নেতা মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে তার ভাই জাফর, ফিরোজ-সহ আরও ১০-১৫ জন সন্ত্রাসী ভূমিদস্যু দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালিয়ে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত বাজার রাধানগর গ্রামের সুকান্ত চক্রবর্তীর পৈতৃক জমির উপর নির্মাণাধীন স্থাপনা সন্ত্রাসীরা হাতুড়ি, লোহার শাবল দিয়ে ভাঙচুর করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এ সময় সুকান্ত চক্রবর্তী-সহ পরিবারের অন্যরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের খুন করার হুমকি দেয় এবং আর কোনোদিন জমির কাছে এলে পরিবার-সহ ভারতে তাড়িয়ে দেওয়ারও হুমকি দেয় সন্ত্রাসীরা। সুকান্ত চক্রবর্তীর পৈতৃক শেষ সম্বল ৬০ শতাংশ জমির মধ্যে ১১ শতাংশ জমি ইতোপূর্বে জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছিল মিজানুর রহমান। বর্তমানে তার মালকানাধীন অবশিষ্ট ৪৯ শতাংশ জমি জবরদখল করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে এই বিএনপি নেতা। মিজানুর রহমান মহম্মদপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের পাঁচ নম্বার ওয়ার্ড বিএনপি'র সভাপতি। এই ঘটনায় হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

হামলা ও লুটপাট ।। বরিশাল জেলার আগৈলঝড়া থানার অন্তর্গত পশ্চিম সুজনকাঠি (মল্লিক বাড়ি) গ্রামের স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র করের স্ত্রী অঞ্জলি করের বাড়িতে গত ১৬ এপ্রিল এলাকার মোঃ হারুণ মল্লিকের দুই ছেলে হাসান মল্লিক ও হাবিব মল্লিকের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ধারালো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। ওরা অঞ্জলি কর, তার পুত্রবধূ ঝর্ণা কর, পুত্র অমিয় কর ও প্রভাত করকে এলোপাথারি কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে ও ঘরের মূল্যবান জিনিষপত্র লুট করে। এসময় ঝর্ণা করকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যেতে চাইলে বাড়ির লোকজনের চিৎকারে এলাকার লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করে। আহতদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই অবস্থায় ফের তাদের ওপর দুষ্কৃতীরা হামলা করতে পারে এই ভয়ে তারা আতঙ্কে রয়েছেন।

ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে ।। সিলেটে হিন্দুদের ত্রাণ সহায়তা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছে 'বাংলা এইড' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। করোনা ভাইরাস সংক্রামণের প্রেক্ষিতে সঙ্কটে পড়া শ্রীমঙ্গলের সদর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের ১০০ পরিবারের (৮০টি মুসলমান ও ২০টি হিন্দু পরিবার) মধ্যে গত ২২ এপ্রিল ত্রাণ বিতরণ করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি। ত্রাণ বিতরণ করার সময় হিন্দু পরিবারগুলোর উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা বলেন, আমরা হিন্দুদেরও ত্রাণ দিচ্ছি। এখন আপনাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলছি। এ ঘটনা শোনার পর সারা দেশে হিন্দুরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

ধর্মান্তরিত করা হলো প্রতিমাকে ।। নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার ধনেশ্বর রায়ের কন্যা প্রতিমা রানি রায় গত ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টার দিকে মন্দিরে পূজা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মামুন ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, মাসুদ রানা, রাশেদ ইসলাম, মশিউর রহমান জোরপূর্বক তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং পরে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলমানে ধর্মান্তরিত করে বিয়ের কাবিলনামা তৈরি করে। প্রতিমার নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় মোসাম্মাত খাদিজা খাতুন।

বাড়ি ও দোকানে লুটপাট অগ্নিসংযোগ ।। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার অন্তর্গত গণকপাড়া গ্রামের মৃত শিউলাল রবিদাসের ছেলে সুমল চন্দ্র রবিদাসের বসতবাড়ি ও তার সেলুন দোকান ঘরে গত ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যা তরিকুলের নেতৃত্বে ৫০/৬০ জনের সন্ত্রাসী বাহিনী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালায়। ব্যাপক ভাঙচুর, মারধর ও লুটপাটের পর বাড়ি ও দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে, তাদের মধ্যে সুমল রবিদাসের ছোট ভাইয়ের গর্ভবতী স্ত্রী গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন। বর্তমানে পরিবারটি মানবেতর জীবন যাপন করছে। এদিকে তরিকুলরা সুমলকে দেশ ত্যাগের হুমকি দিচ্ছে। বলা হচ্ছে নইলে তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। এই ঘটনায় হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

দীঘি দখল করতে হামলা ।। পূর্বপুরুষের দীঘি দখলের উদ্দেশ্যে গত ২৭

এপ্রিল দুপুরে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত জিরাতলী ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামের নরেন্দ্র মোক্তারের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে এলাকার সন্ত্রাসী মোঃ বাবুল ও তার দুই পুত্রের নেতৃত্বে ২৫-৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল। এই হামলায় প্রতীক পাল, উত্তম পাল ও চন্দন পাল গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে প্রচণ্ড ক্ষোভ।

প্রতিমা ভাঙচুর ।। গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ছাপড়াহাটি ইউনিয়নের উত্তর মরুয়া (বকুলতলা) গ্রামে শ্রীশ্রী কালী মন্দিরে গত ২৪ এপ্রিল রাতে দুষ্কৃতীরা মন্দিরের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। ২৫ এপ্রিল লক্ষ্মীপুর জেলার সদর থানার শাঁখারিপাড়ায় রক্ষাকালী মন্দিরেও দুটি প্রতিমা ভাঙা হয়েছে। এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দুদের মধ্যে।

বাড়ি ও মন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ ।। গত ১১ এপ্রিল বিকেলে ফরিদপুরে আলফাডাঙ্গা থানার অন্তর্গত টিটুরকান্দি গ্রামে হিন্দুদের ওপর হামলা চালিয়েছে প্রভাবশালী শাহিন শেখের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী। ওরা হিন্দুদের বাড়িঘর ও মন্দিরে ভাঙচুর ও লুটপাট কর, পরে অগ্নিসংযোগ করে। হামলায় অসিত কুমার সরকার, অন্তর বিশ্বাস, শ্রীমতি মঞ্জু সরকার, অরূপ বিশ্বাস, মনোজ বিশ্বাস, শম্ভু সরকার, গোপাল সরকার, স্বরূপ সরকার, মহাদেব বিশ্বাস ও বিধান বিশ্বাস গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতরা বর্তমানে আলফাডাঙ্গা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গেছে, হামলাকারীরা অসিত কুমার সরকারের দোকানের ক্যাশ বাক্সে রক্ষিত একলক্ষ নগদ টাকা ও বিভিন্ন পরিবারের প্রায় দেড়লক্ষ টাকার আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এর আগে হামলাকারীরা অসিত সরকারের নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা চেয়েছিল, তিনি না দিতে অস্বীকার করায় এই হামলা চালানো হয়। সন্ত্রাসীরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে মারধর করে। এ ঘটনায় গোটা এলাকার হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। হামলাকারীদের মধ্যে ছিল মোঃ রাজীব চৌধুরী ওরফে বুলেট শেখ, ে রফি শেখ ওরফে বোমরা।

হিন্দুদের দেশছাড়া করতে হামলা ।। হিন্দুদের দেশছাড়া করে তাদের জায়গাজমি দখলের উদ্দেশ্যে গত ৩০ মার্চ প্রকাশ্যে দিনের বেলায় বরিশাল জোর উজিরপুর উপজেলার মালিকান্দা গ্রামে হিন্দুপাড়ায় হামলা চালানো হয়েছে। ভুমিদস্যু মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী পনির মিয়া, আনোয়ার হোসাইন, দেলোয়ার হোসেন, এয়ার হোসাইন, বাবু খান ও রেফাতুল্লা-সহ ৪০-৫০ জনের একটি দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবাইকে লাঠিপেটা করে, দা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে। আহতরা হলেন মৃণাল বিশ্বাস, ননী গোপাল বিশ্বাস, মৃন্ময় বিশ্বাস, পরিমল বিশ্বাস, সুনীল বিশ্বাস, লিপি বিশ্বাস, আরতি বিশ্বাস, অনিল বিশ্বাস ও কবিতা বিশ্বাস। আহতরা বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। বর্তমানে সন্ত্রাসীদের ভয়ে এলাকার বহু লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র মানবেতর জীবনযাপন করছে।

ছাত্রী অপহরণ ।। গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি থানার অন্তর্গত হিজলগাড়ি গ্রামের গোপাল চন্দ্র রায়ের মেয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী অন্তরা রানি গত ০৪ এপ্রিল দুপুরে তার মাসির বাড়ি বগুড়ার ধুনট থেকে বাসে বাড়ি ফেরার পথে নুনিয়াগাড়ী নামক স্থানে স্থানীয় মোহাম্মদ আলীর সন্ত্রাসী ছেলে মোহাম্মদ লিখন সরকার তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করে নূরজাহান বেগম, মোহাম্মদ শাহিন মিয়া, রেণু বেগম-সহ আরও কয়েকজন। সন্ত্রাসী লিখন সরকার মেয়েটিকে দীর্ঘদিন যাবৎ উত্ত্যক্ত করে আসছিল। অপহরণের ব্যাপারে স্থানীয় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত অপহৃত মেয়েটিকে উদ্ধার করা যায়নি। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

জোরপূর্বক অপহরণ ।। গত ২২ এপ্রিল ঢাকার ডেমরা থানার বাঁশেরপুল সাধুর মাঠ এলাকার স্বপন চন্দ্র পালের ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়ে দীপা রানি পালকে জোরপূর্বক অপহরণকরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় স্থানীয় জামালের ছেলে শিফাত। অবশ্য প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে শিফাত পরের দিন রাতে দীপাকে নিজ বাড়িতে ফেরত দিয়ে যায়। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুর ।। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার অন্তর্গত শান্তিপুর ইউনিয়নের জাফরাবাদ গ্রামে হরলাল চক্রবর্তীর বাড়ির শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ মন্দির ও শ্রীশ্রীকালী মন্দিরে গত ৮ এপ্রিল রাতে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়, প্রতিমা ভেঙে দেয়। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

ভগবান বুদ্ধের বাণী শান্তিকামী মানুষ আজও সমান ভাবে স্মরণ করে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে বৈশাখী পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে গৌতমবুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪ অব্দে নেপালের লুম্বিনীতে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের বিহারে রাজ্যের গয়ার উরুবেলা গ্রামে নিরঞ্জনা নদীর পশ্চিম তীরে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসে ধ্যানের মাধ্যমে বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং বুদ্ধ হন। এই পূর্ণিমা তিথিতে তিনি ৮০ বছর বয়সে ভারতের উত্তর প্রদেশের কুশীনগরে মহানির্বাণ লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধের জীবনের এই তিনটি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলেই এটি বুদ্ধপূর্ণিমা।

বুদ্ধপূর্ণিমা বৌদ্ধদের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের আবালবৃদ্ধবণিতা সকালে স্নান শেষে নতুন বস্ত্র পরিধান করে বা পরিচ্ছন্ন পোশাকে বৌদ্ধবিহারে সমবেত হন। বুদ্ধপূজার সামগ্রী, বিভিন্ন দানীয় বস্তু ও ভিক্ষুদের জন্য প্রসাদ তারা অর্পণ করেন। এসময় উপাসক উপাসিকারা বুদ্ধপূজায় অংশ নিয়ে পঞ্চশীল-অষ্টশীল গ্রহণ করে। ভিক্ষুসঙ্ঘ ও গৃহীরা আলোচনায় অংশ নেন।

দিবসের কর্মসূচির মধ্যে বিকেলে বুদ্ধের জীবন ও দর্শন নিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এমনকী মন্ত্রী এমপিরাও অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেন। বিকেলে অধিক সংখ্যায় বৌদ্ধরা বিহারে সমবেত হন। সন্ধ্যায় থাকে বিশেষ অনুষ্ঠান। বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং তাদের সরকারি বাসভবনে বৌদ্ধদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

ভারত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। বৌদ্ধধর্ম সুপ্রাচীন, গৌতমবুদ্ধের জীবদ্দশায় ভারতে এই ধর্ম প্রচারিত হয়। ভারতের অতীত ইতিহাস বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস। গৌতমবুদ্ধ ভারতের বিভিন্ন স্থানে

৪৫ বছর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সমগ্র বৌদ্ধ দর্শন চারিয়ার্য সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও প্রতিত্যসমুৎপাত নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান বুদ্ধের বাণী ও উপদেশগুলো ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলোর নির্বাস ধম্মপদেও পাওয়া যায়। তার বাণীর প্রধান হলো মৈত্রী।

তিনি বলেছেন, সকল মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। তিনি মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন। কেবল মানুষ নয়, সকল জীবের সুখ ও মঙ্গল চেয়েছেন। তিনি বলেছেন জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। তিনি আরও বলেছেন, হিংসার দ্বারা হিংসা জয় করা যায় না। তাকে ভালাবাসা বা মৈত্রী দিয়ে জয় করতে হয়। এই মৈত্রী হলো হৃদয় নিঃসৃত। মাতা যেমন রোগশয্যায় তার কাতর সন্তানের রোগমুক্তির জন্য স্বীয় জীবন দান করতেও পিছপা হয় না।

তিনি মৈত্রী ছাড়াও করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার কথা বলেছেন। করুণা হলো অপরের দুঃখে তার পাশে দাঁড়ানো, তার দুঃখ অবসানে সহায়তা করা। মুদিতা হলো অপরের গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়া, অপরের সাফল্যে অভিনন্দন জানানো। এটা শুদ্ধ মন ছাড়া কখনই সম্ভব নয়। আজ মুদিতার চর্চা করাটাই বড়ো বেশি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ মানুষ সহজেই অপরকে বড়ো করতে চায় না। অথচ এর দ্বারা সে যে নিজেও বড়ো হচ্ছে, তা ভুলে তিনি উপেক্ষার কথা বলেছেন। সেটি হলো লাভ-অলাভ, সত্য-মিথ্যা, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে অবিচল থাকা অর্থাৎ লাভে উচ্ছ্বসিত না হওয়া আবার অলাভ বা ক্ষতিতে ভেঙে না পড়া। এভাবে মনকে যে দৃঢ় করতে পারে সেই হয় আলোকিত মানুষ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেছেন, সকল প্রকার পাপকর্ম থেকে বিরত থেকে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে।

বুদ্ধদেবের মহামূল্যবান আর এক উপদেশ হলো তোমার কাছে তোমার নিজের জীবন যেমন প্রিয়, অন্যের কাছে তার জীবনও তেমন প্রিয়। এই বোধটাকে নিজেদের মধ্যে উপমা হিসাবে নিলে তখন সে অন্যকে আঘাত করতে পারে না, হত্যা করতে পারে না। তিনি বলেছেন, আপনাকে দীপ করে জ্বালো— আত্মদীপো ভব। তোমার নিজের মধ্যে যে বোধিশক্তি আছে তাকে জাগাও। তিনি বলেছেন নিজের মুক্তি, নিজের উন্নতি, নিজের সুখের জন্য নিজেকেই উদ্যোগী হতে হবে। তাই মনের অন্ধকারে যে সৎকর্ম প্রেম-প্রীতি সুপ্ত আছে তাকে জ্ঞানের আলো দ্বারা জয় করো।

তিনি বিশেষ ভাবে যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, কৃপণকেও দানের দ্বারা, মিথ্যাকে সত্যের দ্বারা জয় করো। বুদ্ধের বাণীগুলো ত্রিপিটকের ৮৪ হাজার শ্লোকের মধ্যে নিহিত আছে। বুদ্ধ সাম্যের প্রতীক, জ্ঞানের প্রতীক, মহামৈত্রীর প্রতীক। বুদ্ধ মানুষকে সত্যের পথে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। আমরা সমস্ত শান্তিকামী মানুষ আজকের দিনে এই বাণী স্মরণ করছি। তাঁর নির্দেশ বহু জনের হিত ও কল্যাণে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। তঁার আহ্বান, এসো আমরা বৈরীদের মধ্যে অবৈরী হয়ে যারা দুঃখপ্রাপ্ত, ভয়প্রাপ্ত তাদের মাঝে দুঃখহীন ও শোকহীন হয়ে বসবাস করি।

কালের পদধ্বনি শুনিতে কি পাও ?

প্রবাল চক্রবর্তী

পৃথিবীর অর্বুদ বর্ষের জীবনকালে প্রজাতির পর প্রজাতি পালা করে তাঁর বুক থেকে মুছে গেছে, বারবার ঘটেছে সে ঘটনা। এগুলোকে বলে 'এক্সটিংশন লেভেল ইভেন্ট'। বাংলায় বলা যায়— মন্বন্তর। এরকম ছ'টি মন্বন্তরের প্রমাণ পাওয়া গেছে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে। দেখা গেছে, সেই যুগে যেটা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজাতি, মন্বন্তরে ঝাড়েবংশে নির্মূল হয়ে গেছে সেটা। নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে তাদের ফসিলের বুক চিরে।

পুরাণে একটা গল্প আছে, মধু-কৈটভের গল্প। ব্রহ্মা যখন আপন সৃষ্টির ধ্যানে নিমগ্ন, তখন বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে জন্ম হলো মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যের। তারা ব্রহ্মার অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হলো। ব্রহ্মাকে রক্ষা করতে বিষ্ণু জেগে উঠলেন, মধু ও কৈটভকে হত্যা করলেন। ব্রহ্মা আবার সৃষ্টির ধ্যানে মগ্ন হলেন। এই গল্পটা থেকে আমি কী বুঝেছি, সেটা বলি। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা, এ তো আমরা জানি। এখন দেখা যাক, কারা মধু-কৈটভ। মধু অর্থে জীবনদায়ী তরল পদার্থ, কৈটভ অর্থে কীট বা পোকা। অর্থাৎ মধু-কৈটভ হলো একরকমের জলকীট। তারা কি একসময় নব নব জীবনের সৃষ্টির পদ্ধতিটাকেই থামিয়ে দিয়েছিল? 'ব্রহ্মার অস্তিত্ব বিনাশ' মানে কী তাই? তখন কী পালনের শক্তি জেগে উঠে সেই জলকীটের প্রজাতিকে পৃথিবী থেকে মুছে দিয়েছিল? পৃথিবীর ইতিহাস বলছে, এরকম একটি জীব সত্যিই ছিল। নাম তাদের ট্রাইলোবাইট। একসময় পৃথিবীর প্রতিটি সমুদ্র গিজগিজ করত অযুত নিযুত ট্রাইলোবাইটে। কল্পনা করতে ভয় হয়, কেমন ছিল সেই সমুদ্র। হয়তো সে থকথকে সমুদ্র ঢেউ উঠত না। বদ্ধ জলার মতোই গা-ঘিনঘিনে, দমবন্ধ-করা! তারপর কী হলো? রাতারাতি সব ট্রাইলোবাইট মুছে গেল পৃথিবী থেকে।

আমরা মানুষরা ভাবি, এই পৃথিবীটা হলো জড়পদার্থ মাত্র। সেটাই আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো ভুল। পৃথিবীমাতা জড় নন, তিনি সচেতন। বস্তুত, জড় বলে কিছুই নেই এই ব্রহ্মাণ্ডে, সবকিছুই সচেতন। পৃথিবীমাতা এক অতি সচেতন সত্তা, তাঁর সচেতনতা অন্য মাত্রার। প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিরা ছাড়া আর কেউই সেই সচেতনতাকে অনুধাবন ককরতে পারেননি। এই সচেতন মা সদাবৎসলা, সদা-ক্ষমাশীলা। কিন্তু যদি তাঁর একটি সন্তান অন্য সব সন্তানের জীবনহানির কারণ হয়ে ওঠে, তখন মা নির্দয় হস্তে সেই অবাধ্য সন্তানকে কালপটল থেকে মুছে দেন। এটাই নির্মম সত্য। নিরপেক্ষভাবে দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা মানুষরা কিন্তু আজ মধু-কৈটভেরও অধম। 'নব নব জীবনের সৃষ্টি'র সহায়ক হওয়া তো দূরস্থান, আমাদের ভোগের অত্যাচারে প্রতি বছর বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। এর বিপরীত ক্রিয়া তো একদিন না একদিন মানবজাতির ওপর এসে পড়বেই। আমরা ভাবি, মেঘের আড়ালের কোনো অদৃশ্য শক্তি এই পৃথিবীটাকে আমাদের ভোগের জন্য বানিয়েছে। ভুল, মস্ত বড়ো ভুল। লক্ষ কোটি কীটপতঙ্গের মতোই আমরাও বিবর্তনের পথে জন্মেছি। পৃথিবীটা আমাদের নয়, উলটে আমরা পৃথিবীর। এই অতিকায় ভুলের মাশুল আজ প্রজাতির বিলুপ্তি দিয়ে দিতে হতে পারে মানবজাতিকে। করোনা মহামারীতে মানুষ যবে থেকে গৃহবন্দি হয়েছে, তবে থেকে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে খবর আসছে, প্রকৃতি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছেন। কোয়েম্বাটোরের পথেঘাটে ময়ুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সের বন্দরে তিমির দল জলকেলি করছে। সিঙ্গাপুরের জাতীয় উদ্যানগুলোতে ভোঁদড়েরা সপরিবারে চড়ুইভাতি করছে। বহু যুগ পরে কলকাতা বন্দরে ফিরে এসেছে গঙ্গা-শুশুকের ঝাঁক। বাতাস পরিষ্কার, হিমালয় দেখা যাচ্ছে দূরদূরান্ত থেকেও। এসব দেখে আমাদের আনন্দের চেয়েও বেশি লজ্জা পাওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রতিটা প্রজাতি এভাবে আমাদের ভয়ে দিনের পর দিন লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ায়? ধিক আমাদের!

এর আগে ছ'টি মন্বন্তর ঘটেছে। প্রশ্ন জাগছে, মা কি সপ্তম মন্বন্তরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন? চারপাশে যা কিছু দেখছি, সেসব কি তারই পূর্বাভাস? আগামী যুগের বুদ্ধিমান কোনো জীব কি মানুষদের নিয়ে আরেকটা মধু-কৈটভের কাহিনি লিখবে?

মা, আমরা তোমার লোভী নীচ অবোধ সন্তান। অনেক ভুল করেছি। কিন্তু একটু একটু করে সে ভুলগুলো বুঝতে পারছি। হয়তো আমরা শুধরে যাবো। আর একটা সুযোগ দাও মা। মা, তোমার ওই উদ্যত খড়্গ আমাদের ওপর নেমে আসার আগে একবার ভেবে দেখো। আমাদের ছাড়া তোমার ছবিটা কী সম্পূর্ণ হবে? তোমার ওই মন্দিরটা ছাড়া কি তোমার সৃষ্টি অপূর্ণ থেকে যাবে না? আমরা শুধরে যেতে পারি। সেই ইচ্ছাশক্তি আমাদের রয়েছে। মা, আমরা তোমার পথভ্রষ্ট সন্তান, আমাদের এখনই বাদের খাতায় লিখে ফেলো না।

চিঠিপত্র

হিন্দুদের আত্মবিস্মৃত হওয়ার কারণ কি?

বৈদিক যুগ থেকেই আমরা হিন্দুরা দেবাসুরের যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি। জেনেছি আমাদের দেশের বীর যোদ্ধাদের বিক্রম, সাহস, রণনৈপুণ্য এবং বীরত্বের কথা। আমরা আরও জেনেছি ওই সমস্ত বীর যোদ্ধাদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগের কৌশল এবং দক্ষতা। ওইসব বীর যোদ্ধারা অগ্নিবাণ, শক্তিশেল, নাগপাশ, বরুণবাণ, পাশুপত, শব্দভেদী বাণ প্রভৃতি প্রয়োগে খুবই দক্ষ ছিলেন।

বাস্তবে কিন্তু দেখা গেল পারশিকরাজ দারায়ুস, গ্রিকবীর আলেকজান্ডার-সহ শক, হুন, পাঠান, মোগল, পর্তুগিজ প্রভৃতি বহিঃশত্রুরা যখন বারংবার ভারত আক্রমণ করছিল বিশেষ করে মুসলমান আক্রমণকারীরা, তখন ভারতের বীরযোদ্ধাদের পরাক্রম এবং তাদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগের কৌশল বিন্দুমাত্র পরিলক্ষিত হয়নি। মুসলমান আক্রমণকারীরা বারংবার ভারত আক্রমণ করে শত শত জনপদ ধ্বংস করে, মন্দির অপবিত্র করে ভেঙে তছনছ করে। মন্দিরের ধনরত্ন লুঠ করে সহস্র সহস্র হিন্দু পুরুষ ও মহিলাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে, মন্দিরের বিগ্রহ ভেঙে টুকরো টুকরো করে গজনি-সহ বিভিন্ন মসজিদ এবং প্রাসাদের সোপানশ্রেণীতে প্রোথিত করা হয়েছিল যাতে সেগুলি নিয়মিতভাবে মুসলমানদের দ্বারা পদদলিত হতে পারে।

শুধুমাত্র এই নয়। হাজার হাজার বন্দি স্ত্রী পুরুষকে আরবের বিভিন্ন দাসবাজারে দাস-দাসী হিসেবে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হতো এবং কিশোরী বা তরুণীদের সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে ক্রেতাদের পছন্দের অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রাখা হতো বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত। এত সব ঘটনা ইতিহাসসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে হিন্দুদের মুসলমান প্রীতিতে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের মধ্যে। অতীব আশ্চর্যের, এদের অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষরা দেশভাগ হতে মুসলমানদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়। নিজেদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের নৃশংসভাবে নিহত হতে দেখে আর নিজেদের অপহৃতা স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের দুবৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করতে না পেরে রাতের অন্ধকারে একবস্ত্রে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই পশ্চিমবঙ্গে।

অতি আশ্চর্যের, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম সব কিছু বিস্মৃতচ হয়ে এখন মিটিং মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে— 'বাংলা ভাগ করল কে, শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?' সেদিন বঙ্গভূমি ভাগ না হলে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে এদের পূর্বপুরুষরা তাদের নিজেদের পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে পালিয়ে এসে কোথায় আশ্রয় নিতেন সে প্রশ্ন মনে জাগল না। এরা আরও স্লোগান দিতে থাকে, 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই ভেদ নাই, ভেদ নাই'। এই স্লোগান বাংলাদেশে থাকতে কেন দেওয়া গেল না সে প্রশ্ন কেউ করে না। শুধুমাত্র এই নয়। ১৯৪৬ সালে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে কলকাতায় যে নৃশংস হিন্দুহত্যা এবং নোয়াখালিতে নোয়াখালি জেনোসাইডের নামে হিন্দুদের ওপর যে বীভৎস অত্যাচার হয়েছিল সেসব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে এদের মুসলমান প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও আশ্চর্যের, মুসলমানদের চার বিবি নিয়ে সংসার, তিন তালাক প্রথা প্রভৃতি জানা সত্ত্বেও হিন্দুকন্যারা ক্রমাগত মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। ধর্মান্তরিতা হয়ে শাদি করে এক ভিন্ন সমাজে ভিন্ন পরিবেশে আশ্রয় নিচ্ছে। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ জানা সত্ত্বেও। রহস্যটা কী?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

একটি মনীষা প্রসূত বিশ্লেষণ

বিগত দোল পূর্ণিমা সংখ্যায় বিশিষ্ট ইতিহাস বিশ্লেষক ড. জিষ্ণু বসুর 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কর্মজীবনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ'গুলির একটি সহজ অথচ গভীর মনীষা প্রসূত বিশ্লেষণটি পড়লাম। লেখককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তিনি কতিপয় পঙ্ক্তির একটি ক্যাপসুল তৈরি করে বাঙ্গলা তথা বাঙ্গালির একটি গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় বৈষ্ণব কাব্যের অতি সীমিত অংশ পাঠ্যভুক্ত ছিল। আলটপকা মনে পড়ল একটি লাইন। 'যশ প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়'। যথার্থই বৈষ্ণবের চরিত্র লক্ষণ যে বিনয় তা কেবলমাত্র ব্যবহারিক জীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাঙ্গালির পূর্বাপর কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় এই বিনয় প্রভাবিত এক ধরনের পেলবতা বা লাবণ্য দৃশ্যমান হয়। এই দিব্য লাবণ্য শ্রীমহাপ্রভুর দিব্য শরীরেও বিদ্যমান ছিল।

সারা ভারতে বাঙ্গালিকে যে পরিশীলিত আলাপচারিতার জন্য কিছুটা সম্ভ্রম দেখানো হয় তার মূলেও যে মহাপ্রভুর অত্যন্ত সীমিত ৪৮ বছরের জীবনকালের কালজয়ী প্রভাব রয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য। অবশ্য আজকালকার যুব সমাজের মধ্যে যে দোআঁশলা ভাষা পাকাপোক্ত জায়গা করে নিচ্ছে তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। শেষের দিকে চৈতন্যের জন্মকালীন ও তাঁর জীবদ্দশায় যে মনসা কাব্য সমাজে প্রচলিত ছিল সেখানে চৈতন্য ভক্তি-আন্দোলন প্রভাবিত চৈতন্যত্তোর বাঙ্গলায় মনসার আগ্রাসী রূপের পরিবর্তে করুণাময়ী, ক্ষমাশীলা রূপে রূপান্তরের যে nerrative জিষ্ণুবাবু প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা প্রামাণ্য ও অসাধারণ বললে বাড়তি বলা হবে না। কেননা এ নিয়ে অনেকেই অজ্ঞাত ছিলাম। সকলেই কিন্তু রুদ্রচণ্ডী মনসার পাঁচালি শুনে সিন্নি খেয়েছি।

একটি অনেক আগের শোনা প্রসঙ্গ জানার কৌতূহল রয়েছে তা হলো সেই সময় বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়া নিয়ে। 'নেড়া নেড়ির কেত্তন' বলে একটা শব্দবন্ধ চালু হয়েছিল এটি আসলে কী? বা আদৌ কিছু ছিল কিনা? আর একটি কথা শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্রকে কোনো কোনো জায়গায় 'ব্রজরাজ' হিসেবে উল্লেখ করতে দেখেছি। সেটি কতটা সঠিক তা নীহাররঞ্জন রায়, রমেশ চন্দ্র দত্ত বা স্যার যদুনাথ সরকারের মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ পাঠের থেকে জিষ্ণুবাবুর কাছ থেকে সহজপাচ্য হিসেবে জানতে চাই। কেননা কয়েকটি বক্তৃতায় শুনেছি তিনি একজন বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ ও পিএইচডি। দীর্ঘদিন তিনি অত্যন্ত সময়োপযোগী রাজনৈতিক লেখালেখির সঙ্গে তন্নিষ্ঠ ইতিহাস চর্চা করে আসছেন। তাঁর জ্ঞানার্জন আজীবন স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে। কোনো চর্বিতচর্বণ না হওয়ায় তার মধ্যে একটি অন্তর্লীন সুঘ্রাণ থেকেই যায়। তবে লেখার শুরুতেই আশ্চর্যজনকভাবে মিশরের প্রসঙ্গে অতি প্রচলিত ফারাও তুতেনখামেনের জায়গায় তুতেনখামের বা বিখ্যাত রাজবংশ প্রথম রামেসিস থেকে ১৯তম রামেসিস-এর স্থলে 'রামেসাম' বলে দুটি অলীক নামের উল্লেখ হওয়ায় লেখাটির দীপ্তি কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। নামগুলি মিশরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তুতেন খামেনের তিন হাজার তিনশো বছরের পুরনো নাম রয়েছে। আর রামেসিস বংশ শেষ হয় বিশ্ববিজেতা গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের বংশের বহুশ্রুত কুহকিনী ক্লিওপেট্রার মাধ্যমে। জিষ্ণুবাবুর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
হাওড়া, শিবপুর।